অগ্নিপরীক্ষা

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

অগ্নিপরীক্ষা

ারটা ঘটিয়া গেল অবিশ্বাস্য অদ্ভুত।

হেমপ্রভা নিজেও ঠিক এতটা কল্পনা করেন নাই, কিন্তু ঘটিল। পাড়ার গিন্নিরা বলিতে লাগিলেন—"ভগবানের খেলা", "ভবিতব্য"! ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভীত চিন্তিত হেমপ্রভাকে আশ্বাস আর অভয় দিয়া বলিলেন—বিধাতার অদৃষ্ট বিধান! আমরা তো নিমিত্ত মাত্র মা!

কিন্তু এতখানি সারালো তত্ত্বকথার ভরসা সত্ত্বেও কোন ভরসা খুঁজিয়া পান না হেমপ্রভা। ছেলেকে গিয়া মুখ দেখাইবেন কোন্ মুখে? শুধুই কি ছেলে? তার উপরওয়ালা? মণীন্দ্র যদি বা কোনদিন মাকে ক্ষমা করিতে পারে, চিত্রলেখা কি কখনও শাশুড়ীকে ক্ষমা করিবে?

গোড়ার কথা এই—

ছেলে বৌ নাতি-নাতনীদের লইয়া একবার দেশের জমিদারিতে যাইবার শখ হেমপ্রভার অনেকদিনের, কিন্তু সাহেব ছেলের ইচ্ছা যদি বা কখনো হয়—ফুরসৎ আর হয় না, এবং সাহেব স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী চিত্রলেখার ইচ্ছা-ফুরসৎ কোনটাই হইয়া ওঠে না। বছরের পর বছর ঘুরিতে থাকে, মণীন্দ্র পূজার ছুটিতে পশ্চিম আর গ্রীষ্মের বন্ধে উত্তরে বেড়াইতে যান, হেমপ্রভার প্রস্তাবটা মুলতুবীই থাকে।

আসল কথা—বিষয়সম্পত্তি বা জমিদারি নামক বস্তুটার উপর কেমন একটা বিদ্বেষ ভাব ছিল মণীন্দ্রর, দেখাশোনা করা তো দূরের কাথা, মায়ের খাতিরে একবার বেড়াইতে যাইতেও যেন রুচি হয় না। গুরুজনের সম্বন্ধে—তবু মণীন্দ্রর স্বৈণ পিতা যে যথাসর্ব্বস্ব স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়া মণীন্দ্রকে মা'র মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এই অন্যায় ব্যাপারটা আর কিছুতেই বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারেন না মণীন্দ্র, বিষয়ের সমস্ত উপস্বত্বটা নিজের সংসারে ব্যয় [illegible] ত্বও নয়।

[illegible]র জমিদারির টাকা লইতে গেলে মায়ের সই লওয়া ছাড়া উপায় থাকে [illegible] তো শুধু বিরক্তিকরই নয়, অপমানকরও বটে।

অবশ্য [illegible]পের বিষয়ের সুবিধাটুকু না থাকিলে যে দিন চলা ভার হইত এমন

নয়, নিজের উপার্জ্জনে যথেষ্ট ভদ্রভাবেই চলিয়া যায়, কিন্তু হেমপ্রভাই ব জগতে আছে কে? 'মা'র টাকা লইব না' বলিলে যে রীতিমত ঝগড়ার কথ হয়। কাজেই জীবনযাত্রার মানদণ্ড শুধু 'ভদ্রভাবে কাটানো'র অনেক উদ্ধে উঠিয়া আছে। বিলাসিতার তো আর সীমারেখা নাই!

তাছাড়া চিত্রলেখা যা বলে সেটাও তো মিথ্যা নয়। জমিদারিটা মণীন্দ্রর বাপের জিনিস, তাতে তো আর ভুল নাই! কাজেই টাকাটা খরচ করিতে বিবেকে তেমন বাধে না, কিন্তু তদারক-তল্লাস করিতে রুচিতে বাধে।

হেমপ্রভাই বছরে তিনবার ছুটাছুটি করেন।

বরাবরের জন্য যে দেশের বাড়ীতে বাস করতে পারেন না, সেটা শুধু নাতি পুতির মমতাতেই নয়, ম্যালেরিয়া দেবীর নির্ম্মমতার জন্যও বটে। যাই হোক, এবার গ্রীষ্মের বন্ধে অনেক দিনের সাধটা মিটিল হেমপ্রভার। জেদ ধরিল—চিত্রলেখারই ছেলেমেয়ে।

গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্ব হইতেই তাহারা জোর গলায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল —আমরা এবার দেশে যাবো।

চিত্রলেখা বিরক্ত হইয়া বলে—তা আর নয়? "দেশে যাবো!" এই প্রচ গরমে দেশে গিয়ে মারা পড়া চাই যে!

যদিও মেয়ে তাপসীই বড়, তবু যুক্তি-তর্কের ধার অমিতাভর বেশী। বয়স-ছাড়া বিজ্ঞ ভাব দেখাইয়া বলে—দেশে গিয়ে মারা পড়বো মানে কি? 'নানি' যে প্রত্যেক বছর যান, কই মারা পড়েন না তো?

'ঠাকুমা' শব্দটি নেহাৎ সেকেলে বলিয়া চিত্রলেখা 'নানি' শব্দটা আবিষ্কার করিয়াছিল।...ছেলের এই ডেঁপোমিতে জলিয়া উঠিয়া চিত্রলেখা বলে—ওঁর স সয়, তোমাদের তা সইবে? উনি যে এই গরমে গিয়ে কতকগুলো আম-কাঁঠা খেয়ে দিব্যি হজম করেন, তোমরা পারবে তা?

—পারবোই তো! অমিতাভর ছোট সিদ্ধার্থ সোৎসাহে বলে—আম খেতেই যাবো যে আমরা। নানি বলেছেন আমাদের নিজেদের বাগান আছে, অনেক অনেক গাছ। 'দাদু'—মানে বাবার বাবা, নিজে হাতে করে কত গা পুঁতেছেন—দেখবো না বুঝি? বা!

চিত্রলেখার বুঝিতে বাকি রহিল না হেমপ্রভা এবার চালাকি খেলিয়াছেন এইসব সরলমতি বালক-বালিকারা যে 'নানি'র কুমন্ত্রণার প্রভাবেই বিপথগ হইতে বসিয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র থাকে না চিত্রলেখার।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে তার, চড়া গলায় ঝাঁজিয়া বলে—আমি বলে দিচ্ছি এ সময় যাওয়া হতে পারে না—কিছুতেই না। ব্যস্—এ বিষয়ে আর কোনো আলোচনা যেন ওঠে না কোনদিন।

এবার সুর ধরে তাপসী, মেয়েলী আবদারের সুরে বলে—বা-রে, আমরা বলে সব ঠিক করে ফেলেছি—

—সব ঠিক করে ফেলেছ? চমৎকার! কিন্তু আমি জানতে চাই এ বাড়ীর কর্ত্রী কে? তোমরা না আমি?

তাপসী ভয় খাইয়া চুপ করিয়া যায়, কিন্তু অমিতাভ তাহার বদলে চটপট উত্তর দেয়—তাই বলে বুঝি আমরা নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে পাবো না? দেশ-টেশ চিনতে হবে না আমাকে?

—কেন, চিনে কি স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হবে শুনি?

স্বর্গের সিঁড়ি আবার কি, নানি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন না? আমাকেই এরপর খাজনা-টাজনা আদায় করতে হবে তো? প্রজারা আমাকে 'বাবুমশাই' বলবে দেখো তখন।

চিত্রলেখার রাগে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। শাশুড়ীর কুটিল চাল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় বেচারা। এমনিতেই তো তার বরাবর সন্দেহ, শাশুড়ী ছেলেমেয়েগুলি পর করিয়া লইতেছেন। আধুনিকার রঙিন খোলস খুলিয়া ঈর্ষার চেহারা অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে, কিন্তু এবার যে হেমপ্রভা চিত্রলেখার কল্পনার উপরে উঠিয়াছেন! ছেলেদের মন ভাঙাইবার জন্য আরো কি কি লোভনীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন তিনি, সেটা আর শুনিবার ধৈর্য্য থাকে না।

বীরদর্পে স্বামী নামক পোষা প্রাণীটির উদ্দেশে ধাবিত হয়।

যদিও মণীন্দ্র সব বিষয়েই চিত্রলেখার রীতিমত অনুগত, সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা বলিতেও আপত্তি দেখা যায় না তাঁর—যদি চিত্রলেখা সন্তুষ্ট থাকে—কিন্তু এক্ষেত্রে হঠাৎ এমন একটা কথা বলিয়া বসিলেন যেটা সম্পূর্ণ বেসুরো।

বলিলেন—কিন্তু সত্যি এত যখন ইচ্ছে হয়েছে ওদের—না হয় গেলই।

তিন ছেলেমেয়ে যে এইমাত্র অনেক তোশামোদের ঘুষ দিয়া উকিল লাগাইয়া গিয়াছে তাঁকে—সেটা আর প্রকাশ করেন না।

চিত্রলেখা অবাক হইয়া বলে—না হয় গেলই! তোকে মাথার চিকিৎসা

করানো বিশেষ দরকার হয়েছে দেখছি। এই গরমে ওরা যাবে সেই পচা পুকুরে চান করতে?

মণীন্দ্র হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—পচা পুকুরে চান করতেই বা যাবে কেন? আর মা তাই করতে দেবেন কেন? তবে গরম যদি বলো—বাঙলা দেশের পাড়াগাঁ খুব যে—

—থাক্ হয়েছে, তোমাকে আর পল্লীগ্রামের হয়ে ওকালতি করতে হবে না, কিন্তু হঠাৎ তোমার ছেলেমেয়েদের এত দেশ-প্রেম উথলে উঠলো কেন, সে খোঁজ রেখেছো?

মণীন্দ্র উড়াইয়া দিবার ভঙ্গীতে বললেন—ছেলেমানুষের আবার কারণ অকারণ, মা'র মুখে গল্প-টল্প শুনে থাকবে হয়তো—

—থাক্ যথেষ্ট হয়েছে, তুমি আর বালক সেজো না। কিন্তু আমি এই বলে রাখছি, আমার ছেলেমেয়েদের কানের কাছে দিনরাত ওই সব বিষমন্তর ঝাড়তে দেব না আমি। ছেলেরা আজকাল আমাকে গ্রাহ্য করে না তা জানো?

—ওটা এ বংশের ধারা, বুঝলে? বলিয়া মণীন্দ্র হাসিতে থাকেন।

এরকম ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় কার না গা জ্বালা করে?

চিত্রলেখা বিরক্তভাবে বলে—তোমাদের বংশের ধারা শোনবার মত সময় আমার নেই, কিন্তু জেনো—ছেলেমেয়েদের অসুখ করলে সে দায়িত্ব তোমার আর তোমার অপরিণামদর্শী মা'র।

—ছি ছি, অসুখ করবে কেন?

—না, অসুখ করবে কেন! চিত্রলেখা বিদ্রূপহাস্যে মুখ বাঁকাইয়া বলে—বাগানের আম খেয়ে মোটা হয়ে আসবে!

—আমের কথা যদি বললে—মণীন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলেন—ছেলেবেলায় আমিও খুব···ও তুমি বুঝি আবার ওসব গেঁয়োমি পছন্দ করো না? তবে সত্যি, এ সময় মোটা হয়ে যেতাম।

—বেশ তো, তুমিই বা বাকি থাকো কেন? যাও না অমন দাওয়াই রয়েছে যখন, আমাকে সেজকাকার কাছে মুসৌরী পাঠিয়ে দিয়ে চলে যেও। টনিকের বদলে আম-কাঁঠাল—মন্দ কি?

মণীন্দ্র সস্থির স্বরে বলেন—এটা তোমার রাগের কথা, কিন্তু একবার সকলে মিলে দেশে গেলেই বা মন্দ কি চিত্রা?

সত্যি বলিতে কি, ছেলেমেয়েদের উৎসাহের বাতাসে মনের মধ্যে কোথায়

একটু স্নিগ্ধ সুর বাজিতেছিল, মায়ের জন্য একটু সহানুভূতি। কিন্তু চিত্রলেখা কি ধার ধারে এ সুরের?

—সকলে মিলে মেণ্টাল হস্‌পিটালে গেলেই বা মন্দ কি? বলিয়া বিদ্রূপ হাস্তে মুখ ঘুরাইয়া উঠিয়া যায় চিত্রলেখা।

মণীন্দ্র নিঃসন্দেহ হন। মুসৌরীই তাঁহাকে যাইতে হইবে। চিত্রলেখার পূজনীয় সেজকাকার আশ্রয়ে না হোক, কাছাকাছি। কারণ চিত্রলেখার বাপের বাড়ীতে এই সেজকাকাটির কাছে আর সকলেই নিষ্প্রভ, তাই জ্যোতি যদি বিকীর্ণ করিতেই হয় তবে সেজকাকীমার চোখের উপর করিতে পারাই চিত্রলেখার পক্ষে চরম সুখ।

ছেলেমেয়েদের জন্য একটু মন কেমন করে মণীন্দ্রর। এত উৎসাহে জল ঢালিয়া দিবেন? তাছাড়া ছুটিতে বেড়াইতে গিয়া "সেজকাকাদের বাড়ী"র আওতায় থাকা? সেবারে দার্জ্জিলিং গিয়া কি বিড়ম্বনা! উঠিতে বসিতে মায়ের কাছে সেজকাকার বাড়ীর আদর্শের খোঁটা খাইতে খাইতে আধখানা রোগা হইয়া গেল ছেলেমেয়েগুলো। মায়ের সেই খুড়তুতো ভাইবোনদের মত কায়মনোবাক্যে 'সভ্য' হইবার যোগ্যতা তাদের কই? উপরের খোলসটা খুলিয়া ফেলিলেই আসল চেহারা বাহির হইয়া পড়ে যে—সেজকাকাদের চাইতে হেমপ্রভার সঙ্গেই যার অধিক মিল।

শাশুড়ীর উপর এত বিষদৃষ্টি চিত্রলেখার কি সাধে?

ছেলেমেয়েদের মনের মত করিয়া মানুষ করিবার সাধ যে মিটিল না, হেমপ্রভার জন্যই নয় কি? কুসংস্কার আর কুদৃষ্টান্তের পাহাড় হইয়া বসিয়া আছেন চিত্রলেখার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পথ জুড়িয়া। স্বাস্থ্যটা হেমপ্রভার আবার এমনি অটুট যে দূর-ভবিষ্যতেও কোন আলোকরেখা খুঁজিয়া পায় না চিত্রলেখা, বরং নিজেরই তার বারো মাসে দুইবেলা টনিক না খাইলে চলে না।

নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণেই সহিয়া থাকা, তা নয়তো বিধবা মানুষের পক্ষে কাশীর মত উপযুক্ত স্থান আর কোথায়? মনে পড়িলেই স্ত্রৈণ শ্বশুরের উপর মন বিরক্তিতে ভরিয়া যায় চিত্রলেখার।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ছেলেমেয়েদের জেদই বজায় থাকিল।

অবশ্য চিত্রলেখা মুসৌরী চলিয়া গেলো। বাধ্য হইয়া মণীন্দ্রকেও যাইতে হইল। না যাইলে যে কি হইতে পারে সে কথা ভাবিবার সাহস মণীন্দ্রর নাই।

শুধু মাকে ও ছেলেমেয়েদের পাঠাইয়া দিবার জন্ম কয়েকটা দিন পরে গেলেন।

চিত্রলেখায় ছেলেমেয়েরা মাকে কতটা ভয় করে আর কতটা ভালবাসে সে বিচার করা সহজ নয়, তবে আপাততঃ দেখা গেল মায়ের অনুপস্থিতিটা তাদের কাছে প্রায় উৎসবের মত।

নিজেদের ট্রাঙ্ক সুটকেস গুছাইয়া লওয়ার মধ্যে যে এত আমোদ আছে, একথা কি আগে জানা ছিল? চিত্রলেখা অতটা না চটিলে হয়তো এদিকটার তদারক করিয়া যাইত, কিন্তু রাগ-অভিমানের একটা বাহ্যিক প্রকাশ চাই তো!

তাপসী বড়, অতএব ম্যানেজ্‌মেণ্টের দায়টা তার, সে ভাইদের পোশাক-পরিচ্ছদের বহুবিধ ব্যবস্থা এবং অনেক উপদেশ বর্ষণান্তে পিতার কাছে আসিয়া একটা অদ্ভুত আবদার করিয়া বসিল।

মণীন্দ্রর পিতার আমলের একটা পুরানো দেরাজ—যেটা জাতিচ্যুত অবস্থায় ভাঁড়ার ঘরে ঠাঁই পাইয়াছে—তার চাবিটা চাই তাপসীর।

মণীন্দ্র অবাক হইয়া বলেন—কেন বলো তো, ওর চাবি নিয়ে কি করবে তুমি? চাল-ডাল লুকিয়ে রেখে যাবে নাকি? যা গিন্নী হয়ে উঠেছ দেখছি!

তাপসী হাসিয়া বাপের পিঠে মুখ গুঁজিয়া বলে—তাই বই কি? বাঃ! শাড়ী নেবো।

—শাড়ী!

—হ্যাঁ বাবা। ওর মধ্যে মার ছেলেবেলার অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ী আছে; লাল, সবুজ, কতো কি!

—থাকতে পারে, কিন্তু তুমি নিয়ে কি করবে? কাউকে দিতে চাও?

—ইস্ কাউকে দেবো কেন? আমি পরবো।

—তুই শাড়ী পরবি? বিস্ময়ে হতবাক্ মণীন্দ্র শুধু ওইটুকুই বলিতে পারেন।

—পরলে কি হয়? বা রে! দেশে তো আমার বয়সের মেয়েরা শাড়ী পরে। পরে না? নানি বলেছেন—এত বড় মেয়ে শাড়ী পরলেই মানায়।

বারো বছরের মেয়ের মুখে এ হেন পাকা কথা শুনিয়া মণীন্দ্রর ভারী বিরক্তি লাগে, গম্ভীর স্বরে বলেন—তাপসী!

তাপসী ভয় পাইয়া চুপ করিয়া থাকে।

—শোনো, ওসব পাকামি ছেড়ে দাও, খবরদার যেন এ রকম কথা শুনতে না পাই। জানো, তোমাদের মা তোমাদের ওপর রাগ করে চলে গেছেন, আর তোমরা এমন সব কাজ করতে চাও যা তিনি মোটে পছন্দ করেন না!

ব্যস্, আর কিছু বলিতে হয় না।

বড় বড় দুই চোখের কোল বাহিয়া যে জলের ফোঁটাগুলি ঝরিতে থাকে সেগুলি নেহাৎ ছোট নয়। চিরদিনের অভিমানী মেয়ে। চিত্রলেখা এইজন্যই আরো মেয়েকে দেখিতে পারে না। একটিমাত্র মেয়ে হইলেও নয়।

মেয়ে কোথায় চালাক-চতুর, স্মার্ট হইবে, শিশুর মত ছুটাছুটি করিবে, খেলা করিতে আসিয়া মা-বাপের গলা ধরিয়া ঝুলিয়া আদর কাড়াইবে—নকল স্বরে কথা কহিবে—তা নয়, কেমন যেন জবুথবু সেকেলে সেকেলে ভাব। শিক্ষা দিতে যাও, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে।

এবার অপ্রস্তুত হইবার পালা মণীন্দ্রর। চোখের জল বরদাস্ত করা তাঁর কর্ম্ম নয়। চিত্রলেখার অঞ্চলপ্রান্তে নিজেকে নিঃস্বত্ব হইয়া সঁপিয়া দিবার মূল কারণও হয়তো ওই।

গম্ভীর ভাবটা পাল্টাইয়া তাড়াতাড়ি হাল্কা স্বরে বলেন—এই দেখ, একদম নেহাৎ বোকা! নে বাপু যত পারিস শাড়ী নে, দুটো-চারটে একসঙ্গে পরে জগদম্বা ঠাকরুণ হয়ে বসে থাক্‌গে যা। কিন্তু চাবি-টাবি আমি চিনি না তো।

হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছিতে মুছিতে তাপসী ভাঙা গলায় বলে—ছোট আলমারির ড্রয়ারে অনেক চাবি আছে।

—থাকে তো বার করে নাও গে, কিন্তু সাবধান, তোমার মা'র কাছে যেন কোনদিন এই সব শাড়ী-ফাড়ীর কথা ফাঁস করে বলে ফেলো না, বুঝলে? সাংঘাতিক চটে যাবেন।

তাপসী ততক্ষণে ছুটিয়াছে।

কি জানি—বাবা আবার মত বদলাইয়া বসিলে?

কিন্তু দিশাহারা তাপসী কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা রাখিবে? শাড়ীর স্তূপের মাঝখানে বসিয়া খেই পায় না বেচারা। বর্ণ-সমারোহে চোখ যে ধাঁধিয়া যায়, এর কাছে ফ্রক, ছি!

এমন প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সুযোগও তো কখনো মেলে নাই।

কালেকস্মিনে চাকর-বাকরে রোদে দিয়া ঝাড়িয়া তুলিয়া রাখে, হাত দিতে গেলে মা'র কাছে বকুনি খাইতে হয়।...এত শাড়ী চিত্রলেখা পরিল কখন?...

কে জানে, হয়তো সবগুলো পরাও হয় নাই, হয়তো কোনখানা একবার মাত্র অঙ্গে উঠিয়াছে। সঞ্চয়ের নেশায় শুধু যথেচ্ছ জমা করিয়াছে বসিয়া বসিয়া।

ছেলে-বৌ আসিল না বলিয়া সাময়িক দুঃখপ্রকাশ করিলেও একপক্ষে হেমপ্রভা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আসিতে আমন্ত্রণ করিলেও 'মেমসাহেবের' ভয়ে চিন্তারও অন্ত ছিল না, তাছাড়া নাতি-নাতনীদের এমন একাধিপত্যে পাওয়ার সুবিধাও তো হয় না কখনো।

আরো একটা কারণ হয়তো লুকানো আছে মনের মধ্যে। কলিকাতার বাড়ীতে—হেমপ্রভার যেন পায়ের তলায় মাটি নাই, চিত্রলেখার সংসারে তিনি প্রায় অবাঞ্ছিত আশ্রিতের মত। অবশ্য সব দোষই চিত্রলেখার বলা চলে না, হেমপ্রভার শান্তিপ্রিয় ভীরু স্বভাবেরও দোষ আছে কতকটা। নিজের অর্থ-সামর্থ্যের জোরে রীতিমত দাপটের সঙ্গেই থাকিতে পারিতেন তিনি। পারেন না। ছেলেকে বঞ্চিত করিয়া স্বামী যে তাঁহাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া গিয়াছেন, এর জন্য ভিতরে ভিতরে যেন একটি অপরাধ-বোধের পীড়া আছে। হয়তো এতদিনে মণীন্দ্রর নামে দানপত্র লিখিয়া দিতেনও, যদি না চিত্রলেখার স্বভাবের পরিচয় পাইতেন।

যাই হোক কলকাতার বাড়ীতে হেমপ্রভা অবান্তর গৌণ।

কিন্তু এখানে হেমপ্রভার পায়ের নীচে শক্ত মাটি। শুধু পায়ের নীচে নয়, আশেপাশে অজস্র। এখানে হেমপ্রভাই সর্ব্বেশ্বরী, শিশু হোক তবু ওদের কাছেও দেখাইয়া সুখ আছে—আত্মতৃপ্তি আছে।

ভারি খুশি হইয়াছেন হেমপ্রভা।

নাতি-নাতনীদের কাছে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া যেমন একটা তৃপ্তি আছে—তেমনি দেশের লোকের কাছে এমন চাঁদের মত নাতি-নাতনীদের দেখাইতে পাওয়াও কম সুখের নয়। এবেলা-ওবেলা ভালো ভালো জামা-কাপড় পরাইয়া বেড়াইতে পাঠান তাহাদের—যেখানে নিজের যাওয়া চলে সঙ্গে যান। তাপসী যে বুদ্ধি করিয়া মায়ের রঙিন শাড়ীগুলো আনিয়াছে, এর জন্যও আনন্দের অবধি নাই হেমপ্রভার।

শাড়ী না পরিলে মেয়ে মানায় ?

এটি তাপসীও বুঝিতে শিখিয়াছে আজকাল। তাই সকালবেলাই চওড়া

জরিপাড়ের লাল টুকটুকে একখানা জর্জ্জেট সিল্কের শাড়ী পরিয়া ভাঁড়ারঘরের দরজায় আসিয়া হাজির।

—নানি, নানি গো, আজকে সেই যে কোথায় মন্দির দেখতে নিয়ে যাবে বলেছিলে, যাবে না?

—ওমা সে তো সন্ধ্যাবেলা, আরতি দেখতে—

বলিয়া মুখ তুলিয়া যেন অবাক হইয়া যান হেমপ্রভা।

সৌন্দর্য্যের খ্যাতি তাপসীর শৈশবাবধিই আছে বটে, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব তো কোন দিন দেখেন নাই। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী কি হেমপ্রভার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন নাকি? বৈশাখের ভোরেরসন্তফোটা মল্লিকা ফুলের লাবণ্য চুরি করিয়া আনিয়া চুপিচুপি কে কখন মাখাইয়া দিয়া গেল তাপসীর মুখে-চোখে?

এই মেয়েকে চিত্রলেখা বিবিয়ানা ফ্যাশনে শার্ট পায়জামা আর খট্‌খটে জুতা পরাইয়া রাখে। আসিয়া দেখুক একবার! আর একটা কথা ভাবিয়া মৃদু একটা নিঃশ্বাস পড়ে হেমপ্রভার, এই মেয়েকে ওর সাহেব বাপ-মা হয়তো পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত আইবুড়ো রাখিয়া দিবে—পর্ব্বতপ্রমাণ শুকনো পুঁথির বোঝা চাপাইয়া।

কিন্তু এমনটি না হইলে 'কনে'?

মনে মনে ইহার পাশে একটি সুকুমার কিশোর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, আনন্দে বেদনায় হেমপ্রভার দুই চোখ সজল হইয়া আসে।

তাপসী ছেলেমানুষ হইলেও এই মুগ্ধদৃষ্টি চিনিতে ভুল করে না, তার লজ্জা ঢাকিতে আরো ছেলেমানুষি সুরে তাড়াতাড় বলে—সন্ধ্যেবেলা আবার যাবো নানি, এখন চলো—আমি এত কষ্ট করে সাজলাম!···এত বড় শাড়ীটা কি করে পরেছি বলো তো নানি? হুঁ বাবা, ভেতরে এত-টা পাট করে নিয়েছি! ঠিক হয়েছে না?

—খুব ঠিক হয়েছে! হেমপ্রভা দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলেন—আমিই হাঁ করে চেয়ে আছি, এরপরে দেখছি নাতজামাই আমার দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা যাবে।

সভ্য বধূমাতার অসাক্ষাতে এরকম দুই-একটা সভ্যতা-বহির্ভূত পরিচিত পরিহাস করিতে পাইয়া বাঁচেন হেমপ্রভা।

তাপসীও অবশ্য বকিতে ছাড়ে না—যাও, ভারি অসভ্য—বলিয়া পিতামহীর আরো কাছে সরিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

হেমপ্রভা নাতনীর চিবুক তুলিয়া ধরিয়া আদরের সুরে বলেন—তুই তো

বললি 'যাও', কিন্তু আমি শুধু তাকিয়ে দেখি আমার এই রাধিকা ঠাকরুণটির জন্যে গোকুলে বসে কোন্ কালাচাঁদ তপস্যা করছে ?

—ইস্ 'কালাচাঁদ' বই কি—বলিয়া ছুটিয়া পলায় তাপসী।

হেমপ্রভা স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকেন।

বৌমা মেয়েটিকে যত খুকী বানাইয়া রাখিতে চান তত খুকী তাই বলিয়া নাই। এই তো—ঠাট্টাটি তো দিব্য বুঝিয়াছে, উত্তর দিতেও পিছপা নয়। না বুঝিবেই বা কেন, অমন বয়সে যে হেমপ্রভার দুই বৎসর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সুদূর অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে দুই-একটা কথা স্মরণ করিয়া কৌতুকের আভায় প্রৌঢ়া হেমপ্রভার নীরস মুখও সরস দেখায়।

—নানি নানি, দিদিটার কাণ্ড দেখেছ ?

মিলিটারী ধরনের খাকী সুট পরিয়া বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে আসিয়া দাঁড়ায় অমিতাভ। অমিতাভর উচিত ছিল তাপসীর দাদা হইয়া জন্মানো। কিন্তু দৈবক্রমে বৎসরখানেক পরে জন্মানোর খেসারৎ-স্বরূপ বাধ্য হইয়া তাপসীকেই 'দিদি' বলিতে হয় বটে, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই—আর সব বিষয়ে এই ছিঁচকাঁদুনে মেয়েটাকে নিতান্ত অপোগণ্ডের সামিলই মনে করে সে।

হেমপ্রভা হাসিয়া বলে—কি কাণ্ড গো মশাই ?

—এই দেখ না সকালবেলা কনে-বৌয়ের মত সেজে বসে আছে! এঃ, লাল শাড়ী আবার মানুষে পরে ? মাকে কিন্তু আমি বলে দেবো নানি বুঝলে, দিদিটার খালি মেয়েলীপনা! আর ওই রকম গিন্নী বুড়ীর মত জবড়জং হওয়াই ভালো নাকি ? জানো নানি, মালি এত ফুল আর মালা দিয়ে গেছে, সেইগুলো দিদি এখন পরছে বসে বসে। রাম রাম!

—রাম রাম বইকি, আসল কথা দিদিকে স্বর্গের পরীর মতন দেখাচ্ছে বলে তোর হিংসে হচ্ছে, বুঝেছি।

কথটা একেবারে মিথ্যাও নয়, হিংসা না হোক কিছুটা অস্বস্তি হয় বৈকি অমিতাভর। খাটো ফ্রক অথবা ঢিলে পায়জামা শার্ট পরা দিদি তার নিতান্ত নাগালের জিনিস। যে দিদি টফি চকোলেটের ভাগ লইয়া খুনসুড়ি করে, শব্দ প্রতিযোগিতার প্রতিশব্দ লইয়া তর্কাতর্কি করে, পড়ার জায়গায় গোলমাল করার ছুতা ধরিয়া ঝগড়া করে—সে দিদির তবু মানে আছে, কিন্তু শাড়ী-গহনা পরা চুলে ফুলের মালা লাগানো দিদিটা যেন নেহাৎ অর্থহীন, ওর মুখে যে নূতন

রং সেটা অমিতাভর অচেনা, তাই উঠিতে বসিতে শাড়ী-গহনার খোঁটায় অস্থির করিয়া তোলে তাপসীকে।

গহনাগুলি অবশ্য পিতামহীর, তবে হেমপ্রভা চিরদিনই রোগা পাতলা মানুষ, আর তাপসী লাবণ্যে ঢলঢল বাড়ন্ত মেয়ে, তাই গায়ে মানাইয়া যায়। বাক্স খুলিয়া সব সব কিছু বাহির করিয়া দিয়েছেন হেমপ্রভা।

দীর্ঘদিনের অবরোধ ভাঙিয়া অলঙ্কারগুলোও যেন মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। এই মুক্তার শেলি আর জড়োয়ার নেকলেস, সোনার বাজুবন্ধ আর হীরার কঙ্কণ, এদের ভিতরে কি লুকানো ছিল প্রাণের সাড়া? হেমপ্রভার সোহাগমঞ্জরিত যৌবনদিনের স্পর্শ মাখানো ছিল ওদের গায়ে? তাই ছোঁয়াচ লাগিয়াছে তাপসীর ঘুমন্ত মনে?

আগেকার দিনে মেয়েদের সম্মান ছিল না—এটা কি যথার্থ?

মানিনী প্রিয়াকে অলঙ্কারের উপঢৌকনে তুষ্ট করিয়া পুরুষ যে ধন্য হইত, সে কি নারীর অসম্মান? পুরুষের প্রেমের নিদর্শন বহিয়া আনিত যে আভরণ, সে কি শৃঙ্খল?

আজকের মেয়েরা অলঙ্কার আভরণ আদায় করে কলহ করিয়া। ছি!

অমিতাভ আর একটু শানানো গলায় বলে—চুপ করে গেলে যে নানি? ভাবছো কি?

—ভাবছি? ভাবছি তোর দিদি যখন 'কনে বৌ' সেজে বসে আছে—তখন দিদির একটা বরের দরকার তো?

—এঃ, ছি ছি ছি! শেম্ শেম্! দিদি, এই দিদি, শিগগির শুনে যা—

চুলে আটকানো রজনীগন্ধার গোছাটি সাবধানে ঠিক করিতে করিতে তাপসী আসিয়া দাঁড়াইল—যত ইচ্ছে চেঁচাচ্ছিস্ মানে? মা নেই বলে বুঝি!

—তাই তো! আর নিজে যে মা নেই বলে যত ইচ্ছে সাজছিস্! দেখিস্ বলে দেবো মাকে।

ভিতরে ভিতরে সে আতঙ্ক থাকিলেও তাপসী মুখে সাহস প্রকাশ করিয় বলে—বেশ বলে দিস্। কি বলবি শুনি? মেয়েরা যেন শাড়ী পরে না, গয়না পরে না!

—তোর মত তা বলে কেউ ফুলের গয়না পরে না। এঃ!

অভিমানী তাপসী বেলফুলের মালাগাছটি গলা হইতে খুলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইতেই হেমপ্রভা ধরিয়া ফেলেন— দূর পাগলী মেয়ে! ওর কথায় আবার

রাগ? বেশ দেখাচ্ছে। চলো এবেলাই যাই বল্লভজীর মন্দিরে। বোশেখী পূর্ণিমা, আজ সারাদিনই গোবিন্দ দর্শনের দিন। কই, সিধু কই?

—ও তো এখনো প্যান্টে বোতাম লাগাচ্ছে। বুঝলে নানি, মোটেই পারে না ও। কি মজা করে জানো? ভুল ভুল ঘরে বোতাম লাগায় আর টানাটানি করে ঘেমে ওঠে।

—তা ওদের সব চাকর-বাকরে পরিয়ে দেওয়া অভ্যেস, তুই পরিয়ে দিলি নি কেন?

—আমি? আমাকে গায়ে হাত দিতে দিলে তো? আবার বলে কিনা—'সর্দ্দারি করতে আসিস্ না দিদি।' অভীর শুনে শুনে শিখেছে, বুঝলে? নিজে এদিকে মস্ত সর্দ্দার হয়ে উঠেছেন বাবু—বলিয়া হাসিতে থাকে তাপসী।

হেমপ্রভা ডাক দেন—সিধুবাবু, আপনার হলো? আসুন শিগগির, আর বেলা হলে রোদ উঠে যাবে—গরম হবে।

তিন নাতি-নাতনীকে লইয়া বল্লভজীর মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হন হেমপ্রভা। কলিকাতায় ভালো মডেলের দামী গাড়ী থাকিলেও, এখানে হেমপ্রভার বাহন একটি পক্ষীরাজ সম্বলিত পালকি গাড়ী। কর্ত্তার আমলে জুড়ি-গাড়ী ছিল, এখন প্রয়োজনও হয় না—পোষায়ও না।

বল্লভজীর মন্দির নূতন।

পাশের গ্রামের জমিদার কান্তি মুখুজ্জের প্রতিষ্ঠিত নূতন বিগ্রহ 'রাইবল্লভে'র মন্দির। কান্তি মুখুজ্জের পয়সা শুধু জমিদারিতেই নয়—সেটা প্রায় গৌণ ব্যাপার, আসল পয়সা তাঁর কোলিয়ারির।

দেশের লোকে বলে—টাকার গদি পাতিয়া শুইবার মত টাকা নাকি আছে কান্তি মুখুজ্জের। কান্তি মুখুজ্জে নিজে অবশ্য বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু সদ্ব্যয়ের মাত্রাটা বাড়াইয়া চলেন।

হেমপ্রভাবাহিনী মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখেন সমারোহের ব্যাপার। শুধু বৈশাখী পূর্ণিমা নয়—মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাংবাৎসরিক উৎসব হিসাবেও বটে—রীতিমত ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। নাটমন্দিরে নহবৎ বসিয়াছে, 'কীর্ত্তন মণ্ডপে' 'চব্বিশপ্রহর' শুরু হইয়াছে। নৈবেদ্যের ঘরে জনতিনেক বর্ষীয়সী বিধবা রাশীকৃত ফল ও বঁটি লইয়া বাগাইয়া বসিয়াছেন, ফল মূল ধূপধুনার সম্মিলিত

সৌরভে বৈশাখের সকালের স্নিগ্ধ বাতাস যেন থরথর করিতেছে।

এসব অভিজ্ঞতা চিত্রলেখার ছেলেমেয়েদের থাকিবার কথা নয়, মুগ্ধ বিস্ময়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে তাপসী উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় চুপি চুপি বলে—কী সুন্দর নানি! রোজ রোজ আসো না কেন এখানে?

—রোজ? কি করে আসবো দিদি, মহাপাপী যে! তা নইলে শেষকালটা তো এইখানেই পড়ে থাকবার কথা আমার। কলকাতায় গিয়ে—

—নানি! নানি! পিছন হইতে সিদ্ধার্থর আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠ বাজিয়া ওঠে—ওই ওদিকে—ইয়া বড় একটা কি রয়েছে দেখবে এসো! একটা বুড়ো ভদ্দরলোক বললে—'রথ'। রথ কি হয় নানি?

—রথে চড়ে ঠাকুর মাসীর বাড়ী বেড়াতে যান।...কই তুমি ঠাকুরপ্রণাম করলে না?

—ওই যাঃ! ভুলে গিয়েছি—

বলিয়া প্রায় মিলিটারী কায়দায় দুই হাত কপালে ঠেকাইয়াই সিদ্ধার্থ চঞ্চল স্বরে বলে—বোকার মত খালি ঠাকুর দেখছিস দাদা? রথটা দেখবি চল্ না। সত্যিকার ঘোড়ার মত ইয়া ইয়া দুটো ঘোড়া রয়েছে আবার!

এর পর আর অমিতাভকে ঠেকানো শক্ত।

অগত্যা হেমপ্রভাকেও যাইতে হয়।

তাপসী অবশ্য এসব শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে নিবিষ্ট ভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু 'সত্যিকার ঘোড়া'র আকার বিশিষ্ট কাঠের ঘোড়ার সংবাদে হৃদয়স্পন্দন সুস্থির রাখা কি সহজ কথা?

মন্দিরের পিছনে প্রকাণ্ড চত্বরে নানাবিধ মূর্তিধারিণী "রাসের সখী" ও সুউচ্চ রথখানা পড়িয়া আছে। প্রয়োজনের সময় নূতন করিয়া চাকচিক্য সম্পাদন করিতেই হইবে বলিয়া বোধ হয় সারা বৎসর আর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন অনুভব করে না কেউ।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে এবং 'এত বড় পুতুল গড়িল কে'... 'রথের সিঁড়িগুলা কোন্ কাজে লাগে'...'ঠাকুর নিজেই সিঁড়ি উঠিতে পারেন কিনা' প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হেমপ্রভা যখন ফিরিতেছেন, তখন সামনেই হঠাৎ একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল—'কান্তি মুখুজ্জে'! 'কান্তি মুখুজ্জে'! পুজা-উপচার সঙ্গে লইয়া নিজেই মন্দিরে আসিয়াছেন।

জমিদার তো বটেই, তা ছাড়া মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, কাজেই কীর্ত্তনানন্দে বিভোর বৈষ্ণব ভক্তরা হইতে শুরু করিয়া পূজারী, সেবক-সেবিকা, সাধারণ দর্শকবৃন্দ পর্য্যন্ত কিছুটা ত্রস্ত হইয়া পড়ে।

বরাবর নাম শুনিয়া আসিয়াছেন—কখনো চাক্ষুষ পরিচয় নাই। হেমপ্রভা গায়ের সিল্কের চাদরটা আরো ভালো ভাবে জড়াইয়া লইয়া নাতি-নাতনীদের পিছন দিকে সরিয়া যান, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। উপচার-বাহক ভৃত্যটাকে চোখের ইঙ্গিতে সরাইয়া দিয়া কান্তি মুখুজ্জে নিজে আগাইয়া আসিয়া বলেন—কি খোকা, চলে যাচ্ছে যে? প্রসাদ নেবে না?

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অবশ্য সিদ্ধার্থ।

দাদার সামনে প্রতিপত্তি দেখাইবার সুযোগ সে ছাড়ে না। রীতিমত পরিচিতের ভঙ্গীতে কাছে সরিয়া আসিয়া গম্ভীর ভাবে বলে—প্রসাদ আমাদের বাড়ীতেও অনেক আছে। এদের সব রথটা দেখিয়ে আনলাম, এই যে আমার দাদা দিদি আর নানি।·· আচ্ছা ওই মিস্ত্রীটা কোথায় থাকে?

কান্তি মুখুজ্জে কেমন যেন আত্মহারা ভাবে এদের পানে চাহিয়া ছিলেন, হঠাৎ এই অবান্তর প্রশ্নে সচেতন হইয়া বলেন--কোন্ মিস্ত্রীটা বলো তো?

—ওই কাঠের ঘোড়াগুলো যে গড়েছে! আমি একটা ঘোড়া গড়তে দেবো মনে করছি।

সিদ্ধার্থের এ হেন বিজ্ঞজনোচিত সুচিন্তিত মন্তব্যে উপস্থিত সকলেই হাসিয়া ওঠে। কান্তি মুখুজ্জে তাহার গায়ে একটি আদরের থাবড়া মারিয়া বলেন—ঘোড়া কেন দাদা, সোজাসুজি একটা হাতিই গড়তে দিও তুমি, কিন্তু এইটি তোমার দিদি? কী নাম তোমার লক্ষ্মী?

তাপসী অস্ফুট স্বরে নিজের নাম উচ্চারণ করে।

—তাপসী? চমৎকার! কিন্তু এ নাম তো তোমার জন্যে নয় দিদি। তপস্যা করবে সে, যে তোমাকে পেয়ে ধন্য হবে।···সন্দেহ করবার কিছু নেই, ব্রাহ্মণকন্যা তো বটেই, তবু পদবীটা যে জানতে হবে আমার।···তোমার বাবার নাম কি দিদি?

লাজুক দিদি উত্তর দিবার আগেই অমিতাভ গম্ভীর ভাবে বলে—বাবার নাম এম. ব্যানার্জ্জি।

দিদি ও ছোট ভাইয়ের মাঝখানে নিজে কেমন গৌণ হইয়া যাইতেছিল বলিয়াই বোধ করি নিজের সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করিয়া দিতে উত্তরটা দেয়

অমিতাভ। কিন্তু সিদ্ধার্থর কাছে তার পরাজয় অনিবার্য্য।

তীব্র তিরস্কারের ভঙ্গীতে দাদার দিকে চাহিয়া সিদ্ধার্থ বলে—আবার ওই রকম বলছিস্? নানি কি বলে দিয়েছেন? এখানে কি বলতে হয়?…বাবার নাম হচ্ছে—শ্রীমণীন্দ্র বন্দ্যোপ'ধ্যায়, বুঝ্‌লন?

—বুঝে'ছি। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ—

কান্তি মুখুজ্জে সোজাসুজি হেমপ্রভার সামনে আসিয়া বলেন—বাধ্য হয়ে আপনাকে সম্বোধন করতে হলো, লজ্জা করবেন না—আমি আপনার চেয়ে অনেক বড়। এই মেয়েটি আপনার পৌত্রী?

'নানি' শব্দটা সন্দেহজনক বলিয়াই বোধ করি সম্পর্কটা যাচাই করিয়া লন ভদ্রলোক।

হেমপ্রভা মাথা হেলাইয়া জানান তাই বটে।

—তা হলে—আপনার কাছে আমার একটি আবেদন—মেয়েটিকে আমায় দিন। আমার একটি নাতি আছে, মা-বাপ-মরা হতভাগ্য, তবে আমার যা খুদকুঁড়ো আছে সবই তার। কিন্তু সে যাক্—ছেলেটাকে একবার দেখে আপনি কথা দিন আমায়।

হেমপ্রভা যেন দিশেহারা হইয়া যান। অকস্মাৎ এ কি বিপদ!

এ অঞ্চলে কান্তি মুখুজ্জে যে-সে লোক নন। এত বড় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এই বিনীত আবেদনকে হেমপ্রভা উপেক্ষা করিবেন কোন্ মুখে? প্রতিবাদের ভাষা পাইবেন কোথায়? অথচ চিত্রলেখার মেয়েকে দান করিয়া বসিবার স্পর্দ্ধাই বা কোথায়?

তাই সাপ্ও মরে লাঠিও না ভাঙে গোছ সুরে বলেন—আপনার ঘরে যাবে সে তো পরম সৌভাগ্যের কথা, তবে নেহাৎ ছেলেমানুষ—

—ছেলেমানুষ তা দেখতে পাচ্ছি বৈকি, আমার নাতিটাও ছেলেমানুষ যে। অপেক্ষা করবো বৈকি, দু-এক বছর অপেক্ষা করবো আমি, কিন্তু ক্ষমা করবেন আমায়—এ মেয়েকে ছাড়বার উপায় আমার নেই। এর মুখে রাধারাণীর ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি। আমায় কথা দিন।

হেমপ্রভা কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—আপনার ঘরে কাজ করতে পেলে আমি তো ধন্য মনে করবো, কিন্তু ছেলেকে না জানিয়ে—

—নিশ্চয়, জানাবেন তো বটেই,—কিন্তু আপনি ছেলের মা সেটা তো মিথ্যে নয়? আপনার কথা বিলেতের আপীল। তার ওপর আর কথা কি! অবিশ্যি

আমার নাতিকেও আগে দেখুন আপনি···ওরে কে আছিস্···বুলুবাবুকে ডেকে দে তো !

একটি ভৃত্য আসিয়া কহিল—দাদাবাবু ঠাকুরের সিংহাসনে নিশেন খাড়া করছে—

—আচ্ছা একবার আসতে বল্, বলবি আমি ডাকছি।

হুকুমটা দিয়া কান্তি মুখুজ্জে বোধ করি একবার মনে মনে হাসেন···সুন্দরী নাতনীটির জন্য দ্বিধায় পড়িয়াছে···রোসো, তোমাকেও আমার মত ফাঁদে পড়িতে হয় কিনা দেখো।

হ্যাঁ, ফাঁদে পড়িতে হয় বৈকি, একেবারে অথৈ জলে পড়িতে হয় যে। স্বপ্নের কল্পনা যদি প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, দিশাহারা হইয়া পড়া ছাড়া উপায় কি ?

ঠিক এমনি একটি তরুণ সুকুমার কিশোর মূর্ত্তির কল্পনাই করিতেছিলেন নাকি হেমপ্রভা ? দেবতা ছলনা করিতে আসিলেন না তো ? তা নয় তো এ কি অপূর্ব্ব বেশ ! চওড়া জরির আঁচলাদার সাদা বেনারসীর জোড় পরা, কপালে শ্বেতচন্দনের টিপ। জুতাবহীন খালি পা দুইখানির সৌন্দর্য্যই কি কম ! হাতে একটা লাল শালুর নিশান। পিতামহের আহ্বানে আসিয়া হঠাৎ এতগুলি অপরিচিত মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছে···

না, তাপসীর মত অত উজ্জ্বল গৌর রং নয় বটে, কিন্তু প্রথম ফাল্গুনের কচি কিশলয় কি গৌর ? সে কি কম উজ্জ্বল ? মুখশ্রী গঠনভঙ্গী যে তাপসীর চাইতেও নিখুঁত, একথা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না হেমপ্রভার।

—এই যে এসেছ ! কি হচ্ছিল ?

এতগুলি অপরিচিত মূর্ত্তির সামনে নিজের ছেলেমানুষি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বোধ করি বুলুর ছিল না। পিতামহের এ রকম অহেতুক প্রশ্নে মনে মনে চটিয়া গম্ভীরভাবে বলে—সিংহাসনের ওপর নিশেনটা লাগাবো।

—তা বেশ। কিন্তু দেবতার মাথার ওপর আবার একটা শালুর নিশেন খাড়া করা কেন বলো তো ?···বলিয়া সকৌতুকে হাসিতে থাকেন কান্তি মুখুজ্জে।

বুলু আরো গম্ভীরভাবে বলে—তাতে কি ? রথের চূড়োয় নিশেন দেন না ?

—ঠিক ঠিক, নিশ্চয় তো বটে, আমারই ভুল। আচ্ছা এসো, প্রণাম করো এঁকে—মণীন্দ্রবাবুর মা ইনি। মণীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বুঝেছ তো ? ঈশানপুর,

কুসুমহাট···ইত্যাদি ওঁদের।

কান্তি মুখুজ্জের প্রকাণ্ড জমিদারির ঠিক সীমানাতেই এই সব মাঝারি তালুক। তবু বিবাদ-বিসম্বাদের প্রয়োজন হয় নাই কোনদিন।

দায়-সারা-গোছ একটা প্রণাম করিয়া বুলা চঞ্চলভাবে বলে—দাদু, যাই?

—আচ্ছা যাও। এখন তো এসেই পালাবার তাড়া? দেখবো এরপর।··· কি বলেন বেয়ান? হ্যাঁ, বেয়ানই বলি—সম্বন্ধটা যখন পাকা হয়ে গেল! দেখুন, আপনার আর কিছু বলবার আছে? ছেলে দেখলেন তো? এরা যে পরস্পরের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে, এ কি অস্বীকার করতে পারেন?

—না মুখুজ্জে মশাই, প্রত্যক্ষ দেখলাম এ ভগবানের বিধান। বলবার কিছু নেই।··নিজের অজ্ঞাতসারেই কথাটা উচ্চারণ করেন হেমপ্রভা। কে যেন বলাইয়া লয় তাঁহাকে।

কান্তি মুখুজ্জে প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া ওঠেন—হবেই তো, কান্তি মুখুজ্জের চোখ ভুল করে না, বুঝলেন? জমির ওপর থেকে ধরতে পারি কার নীচে আছে কয়লা, আর কার নীচে হীরে!

বিচক্ষণ কান্তি মুখুজ্জে তো হীরক-খনি নির্ণয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু হেমপ্রভার কোথায় সে নিশ্চিন্ততার সুখ?

বাড়ী ফিরিয়া তিনি ছট্‌ফট করিতে থাকেন।

এ কি করিলাম! এ কি করিয়া বসিলাম!

মন্দির-প্রাঙ্গণে এ কি সত্য করিয়া বসিলেন হেমপ্রভা? এ যে কত বড় অনধিকার চর্চ্চা সে কথা হেমপ্রভার চাইতে বেশী কে জানে? কেন হেমপ্রভা দুই হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিলেন না কান্তি মুখুজ্জের কাছে? কেন বলিলেন না—'যে সত্য রাখিতে পারিব না, সে সত্যের মূল্য কি?' নিজের দৈন্য স্বীকার করিয়া লইলেই তো গোল মিটিয়া যাইত!

হেমপ্রভা মণীন্দ্রর মা, তাই তাহার উপরওয়ালা? হেমপ্রভার কথা বলেভের আপীল? হায়, হেমপ্রভার জীবনে এ কথা পরিহাস ছাড়া আর কি! কিন্তু স্পষ্ট করিয়া এই সত্যটুকু প্রকাশ করিবার সাহস কেন হইল না তখন? অহঙ্কার? আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিত?

কিন্তু তাই কি ঠিক? হেমপ্রভার কি তখন অত ভাবিবার ক্ষমতা ছিল? নিয়তি কি এই কথা বলাইয়া লইলেন না হেমপ্রভার বিহ্বলতার সুযোগে?

নিজের মনকে প্রবোধ দিতে যদিও বা নিয়তিকে দায়ী করা যায়, চিত্রলেখার সামনে দাঁড় করাইবেন কাহাকে ? নিয়তিকে ?

তাপসীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন শুনিলে চিত্রলেখা শাশুড়ীকে পাগলা-গারদের বাহিরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে ? হেমপ্রভার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। যে তৃপ্তিটুকু কয়দিন ভোগ করিয়া লইয়াছেন, এ যেন তাহারই খেসারৎ।

নিজের উপর রাগ হয়, কান্তি মুখুজ্জের উপর রাগ হয়, সারা বিশ্বের উপরই যেন বিরক্তি আসে। কোন মন্ত্রের প্রভাবে সেদিনের সকালটা যদি ফিরাইয়া আনা যাইত, মন্দিরের ত্রিসীমানায় যাইতেন না হেমপ্রভা। এত কাণ্ডের কিছুই ঘটিত না।

তবু সেই কিশোর দেবতার মত ছেলেটির মুখ মনে পড়িলেই যেন হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে চায়। মনে হয়, ছেলে-বৌয়ের হাতে ধরিয়া সম্মতি আদায় করিয়া লইতে পারিব না ? না হয় হেমপ্রভার মানটা কিছু খাটো হইল। না হয় জীবনে ওরা আর হেমপ্রভার মুখ না দেখুক, দেবমন্দিরে দাঁড়াইয়া যে সত্য করিয়া ফেলিয়াছেন হেমপ্রভা, তার মর্য্যাদাটুকু শুধু রাখুক ওরা।

মণীন্দ্রর নিজের কোন সত্তা থাকিত যদি, হয়তো এত অকূল পাথারে পড়িতেন না হেমপ্রভা, কিছুটা সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু চিত্রলেখা যে মণীন্দ্রর হৃদয়বৃত্তির সব কিছু আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একথা জানিতে কি বাকি আছে এখনও ?

চিত্রলেখার মুখ মনে পড়িলে কোনদিকে আর কূলকিনারা দেখিতে পান না হেমপ্রভা।

দিন কয়েক কাটে।

হেমপ্রভা ভাবিতে চেষ্টা করেন—ও কিছু নয়, ব্যাপারটা হয়তো ঘটে নাই। সেদিনের সমস্ত কথাগুলি বার বার স্মরণ করিতে চেষ্টা করেন, এমন আর কি গুরুতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তিনি ? মেয়ে-ছেলে থাকিলেই কত জায়গায় সম্বন্ধ হয়…কিন্তু যতই হাল্কা করিবার চেষ্টা করুন, বিগ্রহের সমীপবর্ত্তী মন্দির-প্রাঙ্গণ যেন পাহাড়ের ভার লইয়া বুকে চাপিয়া বসিয়া থাকে।

তা ছাড়া ভুলিয়া থাকিবার জো কই ?

কান্তি মুখুজ্জের বাড়ী হইতে প্রায় প্রত্যহই তত্ত্ব আসিতে শুরু করিয়াছে—একলা তাপসীর জন্যই নয় শুধু, তিন ভাইবোনের জন্য অজস্র খেলনা, খাবার, জামাকাপড়।

হেমপ্রভা নাচার হইয়া মনে মনে ভাবেন—'খাচ্ছা ঘুঘু বুড়ো! ঝুনো ব্যবসাদার বটে!' মুখের কথা হাওয়ায় ভাসিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় বস্তুর পাষাণভার গলায় বাঁধিয়া দিয়া হেমপ্রভাকে ডুবাইয়া মারার কৌশল ছাড়া এ আর কি ?

সব কথা খুলিয়া বলিয়া ছেলেকে একখানা চিঠি লিখিবার চেষ্টা করেন হেমপ্রভা, কিন্তু মুসাবিদা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। এদিকে বিধাতা-পুরুষ একদা যা মুসাবিদা করিয়া রাখিয়াছিলেন, পাকা খাতায় উঠিতে বিলম্ব হয় না তার। হেমপ্রভা কী কুক্ষণেই দেশে আসিয়াছিলেন এবার !

এদিকে নাতির জন্য 'কনে' দেখিয়া পর্য্যন্ত নূতন করিয়া যেন প্রেমে পড়িয়া গিয়াছেন কান্তি মুখুজ্জে। চোখে যৌবনের আনন্দদীপ্তি, দেহে যৌবনের স্ফূর্ত্তি। ...বিবাহের তারিখের জন্য "তুই এক বছর অপেক্ষা" করার প্রতিশ্রুতিটাও যেন এখন বিড়ম্বনা মনে হয়। মনে হয়, এখনি সারিয়া ফেলিলেই বা ক্ষতি কি ছিল ? কবে আছি কবে নাই !

কিন্তু নিতান্ত সাধারণ এই মামুলী কথাটা যে কান্তি মুখুজ্জের জীবনে এত বড় নিদারুণ সত্য হইয়া দেখা দিবে, এ আশঙ্কা কি স্বপ্নেও ছিল তাঁর ?

কে বা ভাবিয়াছিল মৃত্যুদূত এমন বিনা নোটিশে কান্তি মুখুজ্জের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবে ! বয়স হইলেও—অমন স্বাস্থ্য-সুগঠিত দেহ, অমন প্রাণবন্ত উজ্জ্বল চরিত্র, অত আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা হৃদয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটিয়া গেল !

শুধু হেমপ্রভার জন্য রহিল অগাধ পরমায়ু আর দুরপনেয় কলঙ্ক।

কলঙ্ক বৈকি।

শুধু তো বিবাহের কথা দিয়া সত্যবদ্ধ হওয়া নয়, প্রতিকারবিহীন শৃঙ্খলের বন্ধনে সমস্ত ভবিষ্যৎ যে বাঁধা পড়িয়া গেল তাপসীর।

বিবেচক কান্তি মুখুজ্জে যে মৃত্যুকালে এত বড় অবিবেচনার কাজ করিয়া যাইবেন, এ কথা যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিতেন হেমপ্রভা, হয়ত এমন কাণ্ড

ঘটিতে দিতেন না।

অকস্মাৎ মারাত্মক অসুখের সংবাদ বহন করিয়া যে লোকটা আসিল সে শুধু সংবাদ দিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, বিনীত নিবেদন জানাইল—কর্ত্তার শেষ অনুরোধ, হেমপ্রভ যেন তাপসীকে লইয়া একবার দেখা করিতে যান। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হেমপ্রভার সাধ্য কি এ অনুরোধ এড়ান ?

কিন্তু সেখানে যে তাঁহার জন্য মৃত্যুবাণ প্রস্তুত হইয়া আছে সে কথা টের পাইলে হয়তো এ অনুরোধও ঠেলিয়া ফেলা অসম্ভব ছিল না। কিছুই আশঙ্কা করেন নাই, গিয়া দেখিলেন বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত—নাপিত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

কুশল প্রশ্ন ভুলিয়া হেমপ্রভা সেই অর্দ্ধ-অচৈতন্য রোগীর কাছে গিয়া প্রায় তীব্রস্বরে কহিলেন—এ কী কাণ্ড মুখুজ্জে মশাই ?

কান্তি মুখুজ্জে চোখ খুলিয়া মৃদু হাসির আভাস ঠোঁটে আনিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—ঠিকই হলো বেয়ান, দেখছেন না বিধাতার বিধান।

—কিন্তু ওর বাপ-মা জানতে পর্য্যন্ত পেল না, এ মুখ আমি দেখাবো কি করে তাদের ? কি বলে বোঝাবো ?

—অবস্থাটা খুলে বলবেন। বুঝবে বই কি, আপনার ছেলে তো মূর্খ নয়। আর—আর মৃত্যু না হইলে নাকি স্বভাব যায় না মানুষের, তাই পরিহাসরসিক কান্তি মুখুজ্জে মৃদু পরিহাসের ভঙ্গীতে বলেন—সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন, ধরে এনে তো আর জেলে দিতে পারবে না আমাকে! অবিশ্যি বলবেন, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে কান্তি মুখুজ্জে। অসময়ে ডাক এসে গেল যে—করি কি বলুন ?

এ কথায় আর কি উত্তর দেবেন হেমপ্রভা ?

কিন্তু মুদিতপ্রায় নিষ্প্রভ চোখেও ধরা পড়িল হেমপ্রভার অসহায় হতাশ মুখচ্ছবি, তাই কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন—ভাববেন না—আমি কথা দিচ্ছি সুখী হবে ওরা, আমার বুলু বড় ভাল ছেলে, কিন্তু বড় হতভাগ্য। তাই লক্ষ্মীপ্রতিমার সঙ্গে বেঁধে দিলাম ওকে।...আর অভিভাবক ঠিক করে দিয়ে গেলাম ওর। আমি চোখ বুজলে যে ওর পৃথিবী শূন্য, বেয়ান!

ক্লান্তিতে দুই চোখের পাতা জড়াইয়া আসিল।...ওদিকে তখন বিবাহের অনুষ্ঠান শুরু হইয়াছে।...

ক্রন্দনরতা 'কনে'কে অনেকে অনেক বুঝাইয়া চুপ করাইয়াছে।..

কিন্তু ভিতর হইতে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিতেছে তাপসীর। সে তো নিজের হিতাহিত ভাবিয়া নয়, চিত্রলেখা জানিতে পারিলে কি হইবে সেই কথা ভাবিয়াই সর্ব্বশরীর হিম হইয়া আসিতেছে তাহার। যেন তাপসী নিজেই কি ভয়ানক অপকর্ম্ম করিয়াছে!

কান্তি মুখুজ্জে মারা গেলেন পরদিন সন্ধ্যায়।

ফুলশয্যা হইল না, কুশণ্ডিকার সিঁদুর পরিয়া ঠাকুমার সঙ্গে ফিরিয়া আসিল তাপসী।

পাড়ার গৃহিণীরা বলিতে লাগিলেন—'ভগবানের খেলা'··'ভবিতব্য'! ভট্টাচার্য্য টিকি দুলাইয়া আশ্বাস দিলেন—বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধান, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।

কিন্তু হেমপ্রভা কিছুতেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া পান না।

ছেলে-বৌকে মুখ দেখাইবেন কোন্ মুখে—এ উত্তর কে দিবে তাঁহাকে? কঠিন একটা রোগ কেন হয় না হেমপ্রভার? কান্তি মুখুজ্জের মত?···হায়, এত ভাগ্য হেমপ্রভার হইবে?

অথচ এ এমন ব্যাপার যে লুকাইয়া রাখার উপায় নাই, চাপিয়া ফেলার জো নাই!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ছেলের নামে একখানা জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাইলেন, "মা মৃত্যুশয্যায়, শেষ দেখা করতে চাও তো এসো।" পাঠাইয়া দিয়া অবিরত প্রার্থনা করিতে থাকেন কল্পিত রোগ যেন সত্য হইয়া দেখা দেয়···মণীন্দ্র আসিয়া যেন দেখে যথার্থ ই মা মৃত্যুশয্যায়।

অপরাধিনী মাকে তখন ক্ষমা করা হয়তো অসম্ভব হইবে না মণীন্দ্রের পক্ষে।

এবারে বিদেশে আসিয়া চিত্রলেখার মন বসিতেছিল না।

ছেলেমেয়েদের না আনিয়া যে এত খারাপ লাগিবে এ কথা আগে খেয়াল হয় নাই। তাহারা কাছে না থাকিলে ছটা বিকীর্ণ করিবার উপায় কোথা? শুধু নিজেকে দিয়া কতটাই আর প্রকাশ করা যায়? কতই বা সাজসজ্জা করা যায় তিন বেলা?

মেয়েকে তালিম দিয়া গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য কি তবে? যদি উপযুক্ত

মেত্রটাই মাঠে মারা গেল ?

এবার তো আবার শুধু প্রতিবেশী হিসাবে নয়, সেজকাকীর সংসারেই আশ্রয় লইতে হইয়াছে যে—অবশ্য 'পেয়িং-গেস্ট' হইয়া। আসিবার আগে সেজকাকা একখানা বাড়ীর আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে আর জুটিল না। সেজকাকীর ভগ্নীপতির চাহিদা ফেলিয়া তো আর চিত্রালেখাকে দেওয়া যায় না! অগত্যা ভাইঝি ও ভাইঝি-জামাইকে নিজের বাড়ীতেই আশ্রয় দিতে হইয়াছে তাঁহাকে, নেহাৎ যখন আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ভাইঝি তো আর দুঃখী দরিদ্র নয় যে "বিনামূল্যের অন্ন" গলাধঃকরণ করিবে। বরং নিজেদের খরচের উপরিই সে দেয়। কিন্তু তাহাতেই বা শান্তি কই ? সুখ কই ?

সেজকাকার 'কালো কুমড়ো'র মত থেঁদি মেয়েটা যখন নাচিয়া গাহিয়া আসর জমকায় আর পাড়ার লোকের বাহবা কুড়ায়, সেজকাকীর দিদি যখন পাশের বাড়ী হইতে বেড়াইতে আসিয়া বোনঝির রূপগুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া ওঠেন, তখন সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে চিত্রলেখার।

তাপসীকে একবার দেখাইয়া এদের 'বড় মুখ' হেঁট করা গেল না, এ কি কম আপসোসের কথা ? তাপসীর কাছে লিলি ? কিসে আর কিসে! লিলি! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কাকে বলে!… ওই রূপে আবার সাজের ঘটা কত! এই যে নিত্য নূতন পোশাকের চটক, দেখানে-পনা ছাড়া আর কি! মতলব বোধ করি চিত্রালেখাকে অবাক করিয়া দেওয়া। অবশ্য চিত্রলেখা এত নির্ব্বোধ নয় যে অবাক হইবে। লিলির তুলনায় 'বেবি' অর্থাৎ তাপসীর যে আরো কত অজস্র রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ আছে সে কথাগুলি নিতান্তই গল্পচ্ছলে উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—এত যে রকম রকম জামা-জুতো করিয়ে দিচ্ছি বিলাতী দোকানে অর্ডার দিয়ে, তা সৃষ্টিছাড়া মেয়ে কিছু যদি পরবে! অথচ এই দেখ, লিলি! যা দিচ্ছো তাই আনন্দ করে পরছে!

বেবির গানের মেডেলগুলা আনিবার কথা অবশ্য নয়—কিন্তু কি জানি কি ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে! সুট্‌কেসের কোণেই পড়িয়াছিল হয়তো। যাই হোক, আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই পাঁচজনকে দেখানো। নইলে ও আর কি —হরদমই তো পাইতেছে! রেডিও কোম্পানী তো চিত্রলেখার বাড়ীর মাটি লইয়াছে। চিত্রলেখার ইচ্ছা নয় যে তুচ্ছ কারণে মেয়ে গলা নষ্ট করে। হ্যাঁ, তবে 'হিজ্ মাস্টারস্'-এর ওখানে বরং এক-আধবার পাঠানো চলে।…সেজ-

কাকী আর তন্দ্রা দিদির দুর্ভাগ্য যে, 'বেবী'র গান শুনিয়া জীবনটা ধন্য করিয়া লইবার সুযোগ পাইলেন না।

প্রথম প্রথম কথা কহার সুখটুকুই ছিল—কিন্তু ইদানীং যেন সেটাও যাইতে বসিয়াছে। দেখা যাইতেছে এসব গল্পে আর কেউ বিশেষ আমল দিতেছে না। এমন কি মণীন্দ্র পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে চিত্রলেখার কাছে কথার ট্যাক্স চান। চিত্রলেখা নাকি আজকাল বড় বেশী বাজে বাজে কথা বলে!

শোনো কথা! এরপর আবো যে কি না-কি বলিয়া বসিবেন মণীন্দ্র কে জানে! বৃদ্ধ হইতে যে আব বিশেষ বাকি নাই সেটা ধরা পড়ে এমনি বুদ্ধিভ্রংশ কথাবার্ত্তায়। সংসারে কি আছে না-আছে মণীন্দ্র জানেন? না বেবির গুণপনার সব হিসাব তিনি রাখেন? তবে? যা-তা একটা বলিয়া চিত্রলেখার মুখ হাসানো কেন?

রাগে রাগে কোন সময়ই তাই আর চিত্রলেখা মুখে হাসিই আসিতে দেয় না। এমনই 'যাই-যাই' গোছের মনের অবস্থায় হঠাৎ হেমপ্রভার 'তার' আসিয়া হাজির হইল।

অন্য সময় হইলে চিত্রলেখা হয়তো শাশুড়ীর এরকম বেয়াড়া আবদারে রীতিমত জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু এক্ষেত্রে মনে করিল—যাক্, তবু মন্দের ভালো। স্বামীর কাছে মান খোয়াইয়া কলিকাতায় ফেরার কথা তোলা যাইতেছিল না, এ তবু একটা উপলক্ষ্য পাওয়া গেল।

টেলিগ্রামখানা বার দুই-তিন পড়িয়া মণীন্দ্র বোধ করি মায়ের অসুখের গুরুত্বটা নির্ণয় করার চেষ্টা করিতেছিলেন, চিত্রলেখা সাড়া দিয়া কহিল—তা হলে যাবে নাকি?

—যাবো না! মণীন্দ্র অবাক হইয়া তাকান। অবশ্য কিছুটা বিরক্তিও ধরা পড়ে প্রশ্নের সুরে।

—হ্যাঁ, যাবে তো নিশ্চয়ই, প্রশ্ন করাই অন্যায় হয়েছে আমার, যাক্, আমিও মনে করছি চলে যাই এই সঙ্গে, আমায় কলকাতায় নামিয়ে দিয়ে তুমি পরের ট্রেনে চলে যেও।

মণীন্দ্র বোধ করি সামান্য আশা করিয়াছিলেন, মায়ের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সস্ত্রীক উপস্থিত হইতে পারিবেন, কিন্তু চিত্রলেখার প্রস্তাবে হতাশ হন। কর্ত্তব্যবোধ জাগাইবার দুরাশা অবশ্য নাই, তবু ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করেন—তোমার একবার না যাওয়াটা ভাল হবে? ধরো যদি মা'র—

যতই হোক মা, তাই অকল্যাণকর বাকি কথা বোধ করি উচ্চারণ করিতে বাধে মণীন্দ্রর।

চিত্রলেখার অবশ্য জানিতে বাকি নাই, মণীন্দ্রর প্রাণ পড়িয়া থাকে কোথায়! নেহাৎ নাকি চিত্রলেখা বেশী আদিখ্যেতা দেখিতে পারে না, তাই 'মা মা' করিয়া বাড়াবাড়ি করিবার সাহস হয় না। তবে চিত্রলেখার অত শখ নাই। অগ্রাহ্যের ভঙ্গীতে বলে—তুমি যতটা 'সিরিয়াস্' ভাবছো, আমার তো তা মনে হচ্ছে না। সেকেলে মানুষ, অল্পে ব্যস্ত হওয়া স্বভাব আর কি! হয়তো সামান্য কিছু হয়েছে, 'তার' ঠুকে দিয়েছেন।

—বেশী যে হয় নি তারই বা প্রমাণ কি পাচ্ছ তুমি?

—প্রমাণ আবার কি, নিজের ধারণার কথাই বলছি! কেবল তর্ক, চিরদিন এক স্বভাব গেল! যাক্, তোমার মা'র বিষয় তুমিই ভাল বুঝবে, তবে তোমার যদি এতই তাড়া থাকে, বর্দ্ধমানে নেমে পড়ে চলে যেও কুসুমহাটি, হাওড়া স্টেশনে এসে একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে বাড়ী পৌছবার ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে।

—তাহলে তুমি না যাওয়াই ঠিক করলে? কাজটা কি রকম হবে তাই ভাবছি!

চিত্রলেখা এবার ঈষৎ নরম সুরে উত্তর দেয়—বেশ তো, তুমি গিয়ে অবস্থা দেখে একটা টেলিগ্রাম করেও দিতে পার তো। দরকার বুঝি—যাওয়া এমন কিছু শক্ত নয়, ঘণ্টাকয়েকের মামলা, আমার পক্ষে এখন তৈরি হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। উঃ, বিরাট জিনিসপত্র ম্যানেজ করা—

মণীন্দ্র দোষারোপের ভঙ্গীতে বলেন—তখনই বলেছিলাম 'লগেজ' বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে—ছেলেমেয়েরা এলো না, মাত্র দু'জনের জন্যে সাতটা সুটকেস, দুটো হোল্ডল—

—সে তুমি বলবে জানি, অথচ সেজকাকার বাড়ীতে থাকা হলো বলেই না এ সব লাগেজ বাড়তি মনে হচ্ছে! একটা সংসার ম্যানেজ করতে হলে কত কি লাগে! তা ছাড়া ছোটলোকের মত একই ব্লাউজ বার বার পরতে আমার প্রবৃত্তি হয় না সে তো তোমার অজানা নয়। কি আর করা যাবে?

স্বামীর সঙ্গে দুই দণ্ড প্রেমালাপ করিবে কি, কথাবার্ত্তা শুনিলেই যে গা জলিয়া যায় চিত্রলেখার! উপরে যতই পালিশ পড়ুক লোকটার, ভিতরে যে কোথায় একটু গ্রাম্যভাব রহিয়া গিয়াছে, যেটা এমন চটকদার পালিশের নীচে

হইতেও মাঝে মাঝে উঁকি মারে, অন্ততঃ চিত্রলেখার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়িতে দেরি হয় না।

চিত্রলেখা উঠিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই সেজকাকীমার আবির্ভাব ঘটিল। বয়সে চিত্রলেখার চাইতে কয়েক বৎসর বড় হওয়াই সম্ভব, তবে সাজসজ্জায় চলনে-বলনে বয়স ধরা পড়ে না। চশমার কাঁচ মুছিতে মুছিতে ভাটিয়ালী শাড়ীর আঁচল পিঠে ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পূজনীয়া খুড়শাশুড়ী—মণীন্দ্র তাড়তাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে অবহিত হন, অবশ্য দাঁড়ান না। মাজ-ঘষা মিহি গলায় অনুযোগের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে—এ তোমার অন্যায় মণীন্দ্র। তোমার মার অসুখ, বেশি হোক কম হোক —তুমি যাবে, উচিতও যাওয়া—কিন্তু ও বেচারাকে খামকা সেই জঙ্গলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যাওয়া কেন?

মণীন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলেন—আমি তো বলিনি যেতে!

—ইচ্ছে প্রকাশ করছো তো! সেও একরম বলাই হলো! আমাদের তো ইচ্ছে নয় যে ও তাড়াতাড়ি চলে যায়। তা ছাড়া এখানে এসে ওর হেল্‌থটা একটু ইম্‌প্রুভ করছিল—অবশ্য তোমার মতামতের ওপর কথা বলতে চাই না, তবে তোমাদের কাকাবাবু বলছিলেন—'পরে আমাদের সঙ্গে গেলেই হতো।'

বোঝা গেল কাকাবাবুর দূত হিসাবেই আসিয়াছেন তিনি, নিতান্তই কর্তব্যের খাতিরে। তা নয়তো স্বেচ্ছায় ঝঞ্ঝাটকে আগলানো! একটু আশ্চর্য্য বৈকি! অবশ্য আগে আগে যখন চিত্রলেখার সেজকাকীমার প্রতি দৃষ্টিটা ছিল বিমুগ্ধ বিচঞ্চল, তখন ভাসুরঝিকে খুব পছন্দই করিতেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু ইদানীং যেন চিত্রলেখাই তাঁহাকে 'তাক' লাগাইয়া দিতে চায়। কাজেই পছন্দটা বজায় রাখা দুষ্কর। হ্যাঁ, তবে বাহিরে সভ্যতার ঠাট বজায় রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্টই আছে। ওটা এখনও কিছুকাল সেজকাকীমার কাছে শিখতে পারে চিত্রলেখা।

শাশুড়ী-জনোচিত মর্য্যাদা তিনি রক্ষা করেন জামাতার কাছে—মেয়েকে আরো কিছুদিন রাখিবার অনুরোধ জানাইয়া।

মণীন্দ্র এতক্ষণ 'পাইপ' সরাইয়া রাখিয়া ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ বোধ করিতেছেন। কথায় ছেদ টানিয়া দিতে তাড়াতাড়ি বললেন—বেশ তো থাকুক না আপনাদের কাছে, আপত্তির কি আছে! আমি রাত্রের ট্রেনেই

স্টার্ট করবো।

সেজকাকীমা একটু ফাঁপরে পড়েন। দূত হিসাবে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজস্ব ইচ্ছাটা তো আর বিসর্জ্জন দিয়া আসেন নাই। তাই আরো মিহি আরো অমায়িক স্বরে বলেন—অবশ্য জীবন-মরণের কথা কিছুই বলা যায় না, চিত্রার সঙ্গে যে তোমার মা'র একবার শেষ দেখা হবে না—এটাও যেন না হয়, জোর করে আটকাতে আমি চাই না।

—না, আপনার আর দোষ কি, উনিনিজে যা বিবেচনা করবেন—বলিয়া যেন অন্যমনস্ক ভাবে পাইপটা টেবিলে ঠুকিতে থাকেন মণীন্দ্র। চিত্রলেখা কি আর সাধে বলে, ভিতরে ভিতরে গ্রাম্যতা ঘোচে নাই! শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে কে তাঁহাকে পাইপ ধরাইতে নিষেধ করিয়াছে মাথার দিব্য দিয়া?

টেলিগ্রামখানা ছাড়িয়া পর্য্যন্ত ঘর-বার করিতেছিলেন হেমপ্রভা।

কি বলিবেন? কি করিবেন? আসিবা মাত্রই কাঁদিয়া-কাটিয়া ছেলে-বৌয়ের হাত ধরিয়া ক্ষমা চাহিবেন? না রোগের ভান করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিবেন? তাপসীকে না হয় সিঁদুর ঢাকিয়া বাঁকা সিঁথি কাটিয়া রাখিবেন, ছেলেদের ও চাকরবাকরদের না হয় শিখাইয়া রাখিবেন কোন কথা প্রকাশ না করিতে। ধীরে ধীরে মেজাজ বুঝিয়া…কিন্তু তারপর? তারপর কি বলিবেন হেমপ্রভা? কি বলিবেন ভাবিতে গেলে যে বুদ্ধিবৃত্তি অসাড় হইয়া যায়!

বর্ত্তমান যুগে দেবতারা যে বধির এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি! হেমপ্রভার এত প্রার্থনা বিফল হইয়া স্বাভাবিক নিয়মে দিনরাত্রি আবর্ত্তিত হইতে থাকিল, হেমপ্রভার হার্টফেল হইল না, দৈব দুর্ঘটনা ঘটিল না, সামান্য একটু জ্বর পর্য্যন্ত দেখা দিল না।…সম্ভাব্য সময়ে স্টেশনে গাড়ী গেল এবং সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যথার্থ রোগিণীর মত নির্জীব হইয়া বিছানায় আশ্রয় লইলেন হেমপ্রভা।

কথায় বলে, বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো! এমন নিরেট সাবধানতার মাঝখানে যে এত বড় ছিদ্র ছিল সে কথা কে হুঁশ করিয়াছিল! সব প্রথম যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা—গাড়ীর সেই কোচম্যানটাকে যে সাবধান করিয়া রাখা হয় নাই, সেটা আর খেয়ালে আসে নাই হেমপ্রভার!

সময় যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে বুকের স্পন্দন তত দ্রুত হইয়া ওঠে।

অবশেষে গাড়ীর চাকার শব্দ—গেট খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ—পরিচিত জুতার শব্দ বুকের উপর যেন হাতুড়ি পিটিতে থাকে—কিন্তু চিত্রলেখা কই? শুধু একটা ভারী জুতার শব্দ কেন?…না, চিত্রলেখা আসে নাই। 'ঈশ্বর আছেন' শুধু এইটুকু চিন্তা করিতে না করিতে ছেলের মুখ দেখিয়া হেমপ্রভা চোখে অন্ধকার দেখেন।…না, গোপন নাই। সেই ভয়ঙ্কর কথাটা প্রকাশ হইয়া গিয়েছে। মুখ দেখিয়া সন্দেহ থাকে না কিছু। এক মিনিট‥ দুই মিনিট… প্রত্যেকটি মিনিট এক-একটি বৎসর। জলদগম্ভীর স্বরে শুধু একটি উচ্চারণ করেন মণীন্দ্র—'মা'!

একটি শব্দের মধ্যে কত অজস্র ভাব!

হেমপ্রভা আব নিজেকে সামলাইতে পারেন না। 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিয়া ওঠেন—আমাকে তুই সাজা দে মণি, তোর যা মন চায় সেই শাস্তি দে আমাকে, মেয়েটাকে কিছু বলিসনি।

—বলবার তো আর কিছু রাখোনি মা, বলবার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছি না আমি।

মণীন্দ্রর কণ্ঠস্বরে রোষ ক্ষোভ হতাশা নিরুপায়ের বেদনা সব কিছু যেন ভাঙিয়া পড়ে।

—মণি, আমায় তুই মার! মেরে ফেল্ আমায়—

—পাগলামি করো না মা, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন যে চিত্রা আসতে চাইল না। কিন্তু এ কি করলে মা? কি করলে? বেবিটাকে মিথ্যে করে দিলে একেবারে? চিরদিনের মত মাটি করে দিলে?

—নিজের অপরাধ কমাতে চাই না মণি। হেমপ্রভা হঠাৎ যেন কোথা হইতে বল সঞ্চয় করিয়া উঠিয়া বসেন, অপেক্ষাকৃত ধীরস্বরে বলেন—জানি আমারই সমস্ত দোষ, তবু একটি কথা তোমায় বলবো আমি—অপাত্রে পড়েনি তাপসী। হয়ত তুমিও সে ছেলেকে দেখলে—

—থাক্ থাক্, ও কথা আমার সামনে আর বলো না মা। একটা বাচ্চা ছেলে—সে আবার অপাত্র-সুপাত্র! কান্তি মুখুজ্জে কোলিয়ারি কিনে অনেক পয়সা করেছে বটে, কিন্তু মা-বাপ-মরা নাতিটাকে কি সুশিক্ষা দিয়েছে তার খবর জানো কিছু! ম্যাট্রিক পাস করেছে কি করেনি তাও জানো না বোধ হয়। উঃ, আমার সমস্ত আশা ধ্বংস হয়ে গেল! তোমার বুদ্ধির ওপর একটু আস্থা ছিল, কিন্তু তোমাকে যে লোকে এত বড় ঠকানোটা ঠকাতে পারে এটা

কোনদিন ধারণা করতে পারিনি।

হেমপ্রভা সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া শান্তভাবে বলেন—ঠকা-জেতা তুমি নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখো। সে ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে মরেছেন যে, মা-বাপ-মরা ছেলেটার একটা অভিভাবক ঠিক করে দিয়ে গেলেন। সেই অভিভাবকের কাজ তুমি করো, ও যাতে মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠে দেখো। পয়সার তো অভাব নেই তার—

—বুঝেছি মা, পয়সার লোভটাই সামলাতে পারোনি তুমি। মণীন্দ্র নীরস স্বরে মন্তব্য করেন—তোমার ওপর ধারণাটা অনেক উঁচু ছিল, যাক সে কথা, তবে পরের ছেলের অভিভাবক সাজবার স্পৃহা আমার নেই। বেবি-অভীদের তৈরি হতে বলো, বিকেলের ট্রেনে বেরোবো।

—আজকেই চলে যাবি মণি? তার একবার খোঁজ করবি না? বুড়ো মাকে তুই জীবনেও ক্ষমা না করতে পারিস করিসনে, কিন্তু মেয়েটার আখের ভাব! শুনেছি পাসের খবর বেরোলে কলকাতার হোস্টেলে পড়তে যাবার কথা, এখন ঠাকুর্দ্দা মরে গিয়ে কি অবস্থায় আছে বেচারা, কোন খবরই নিতে পারিনি, তুই একবার খোঁজ করে দেখ্—

—যে অনুরোধ রাখতে পারবো না, সে রকম অসঙ্গত অনুরোধ করো না মা। ...অভী! অভী! এই যে, তোমরা এখনি তৈরি হয়ে নাও, বিকেলের গাড়ীতে কলকাতায় ফিরতে হবে।

মায়ের যাওয়ার নাম মাত্র উচ্চারণ করেন না মণীন্দ্র। রায় দিয়া গম্ভীরভাবে উঠিয়া যান।

হেমপ্রভা অবাক অনড় ভাবে বসিয়া থাকেন। না, মণীন্দ্র তাঁহাকে তিরস্কার করে নাই, গালি দেয় নাই, কিন্তু চিত্রলেখা এর চাইতে আর কত বেশী অপমান করিতে পারিত!

ভয়! ভয়!

ছোট্ট মনটুকু আচ্ছন্ন করিয়া আছে এই করাল দৈত্য।

অপরাধটা তার দিক হইতে হইল কখন একথা জানে না তাপসী, তবু সেই অজ্ঞাত অপরাধের ভারে বেচারা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ বাবা তাহাদের কাহাকেও তো কই এতটুকু তিরস্কার পর্য্যন্ত করিলেন না।

নানির সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হইল কে জানে, তবু নানির ঘর হইতে বাহির হইবার সময় বাবার অস্বাভাবিক থমথমে মুখ দেখিয়া, একলা তাপসী কেন, তিনটি ভাই-বোনই সন্ত্রস্ত হৃদয়ে বিরাট বাড়ীর একটু নির্জ্জন কোণ খুঁজিয়া নীরবে বসিয়া ছিল।

ছোট্ট সিদ্ধার্থও যেন অনুভব করিতে পারিতেছে, যা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা অন্যায় অসঙ্গত—না ঘটিলেই বাঁচা যাইত। এই অসঙ্গত আচরণের কৈফিয়ৎ বুঝি সকলকেই দিতে হইবে। কখন সেই রুদ্রমেঘ ভাঙিয়া পড়িবে, সেই আশঙ্কায় শুদ্ধ হইয়া থাকে তিনজন।

কিন্তু ভাঙিয়া পড়িল না। ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া শুধু এইটুকু জানাইলেন মণীন্দ্র যে বিকালের গাড়ীতেই রওনা হইতে হইবে তাহাদের।

কিন্তু ভাঙিয়া যে পড়িল না সেইটাই কি স্বস্তির? বরং কঠিন তিরস্কারের ভিতর কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব ছিল। বাবার মূর্ত্তিটাই যে তিরস্কারের মত উদ্যত হইয়া রহিল।

ভয়! ভয়!

ট্রেনের গতি দ্রুত হইতেছে—আর নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে কলিকাতা—যেখানে চিত্রলেখা আছেন। হায়, মা'র সঙ্গে মুসৌরী যাইলে তো এত কাণ্ডের কিছুই ঘটিত না! কেনই যে দেশে যাইবার শখ এত প্রবল হইল!··· আচ্ছা সেই ছেলেটিও এই ট্রেনেই কলিকাতা আসিতেছে না তো? কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবার কথা ছিল।···বুড়ো ভদ্রলোক তো মারা গেলেন—বাড়ীতে নাকি আর কোন লোক নাই।···কী আশ্চর্য্য, অতটুকু একটা মানুষ অত বড় একটা বাড়ীতে একলা থাকিতে পারে নাকি! কে যেন বলিতেছিল—বরাবর রাণীগঞ্জে থাকে ওরা। সেখানেই বা আছে কে? মা বাপ ভাই বোন কিছুই নাই, এ আবার কি রকম কথা! একটিমাত্র দাদু, তাও তো মরিয়া গেলেন··· আচ্ছা সারাদিন কথা কয় কার সঙ্গে? চাকর? ঠাকুর? দূর!···কলকাতায় কত কলেজ··· সব কলেজেই হোস্টেল থাকে?···তাপসীও ম্যাট্রিক পাসের পর কলেজে ভর্ত্তি হইবে—উঃ, কত দেরি তার—তিন-তিনটি বছর পরে তবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা!

—বেবি, জানলার ধার থেকে সরে এস, কয়লার গুঁড়ো লাগছে মুখে!

বাপের কণ্ঠস্বরে অত চমকাইবার কারণ কি ছিল ?

যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে তাপসী। আবার সেই ভয়টা বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে—শ্রীরামপুর···উত্তরপাড়া···লিলুয়া—নামগুলো নূতন নাকি ? বুকের ভিতর এত শব্দ কেন ? চিত্রলেখা নিকটবর্ত্তী হইতেছেন বলিয়া ?

ছেলেমেয়েদের ও স্বামীর মুখ দেখিয়া শাশুড়ীর মৃত্যু সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না চিত্রলেখার। তা এত তাড়াহুড়া করিয়া মরিবার কি দরকার ছিল ? চিত্রলেখার বদনাম করিতে ছাড়া আর কি! যাক্ তবু ভালো, মনের দুঃখে গেঁয়ো ভূতদের মত জুতা খুলিয়া পা-খালি করিয়া আসিয়া হাজির হন নাই মণীন্দ্র! স্বামীর কাছে অন্ততঃ এটুকু সভ্যতাজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কিছুটা হৃষ্ট হয় চিত্রলেখা।

স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলায় না, বড় মেয়ে-ছেলের কাছেও কেমন যেন একটু লজ্জা করে, তাই চুপিচুপি সিদ্ধার্থকে ডাকিয়া প্রশ্ন করে—তোমাদের নানি কবে মারা গেলেন ?

—নানি! দুই চোখ বড় করিয়া সিদ্ধার্থ মায়ের মুখের পানে তাকায়। মা কি হঠাৎ পাগল হইল নাকি ? তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—নানি মারা যাবেন কেন ?

—ওঃ! যাননি তাহলে ? ধন্যবাদ। তা তোমরা হঠাৎ অসুস্থ মানুষকে ফেলে চলে এলে যে ? একটু ভাল আছেন বুঝি ?

টেলিগ্রামের কথা ছেলেমানুষ সিদ্ধার্থ জানে না, জানিবার কথাও নয়, তাই একটু থামিয়া বলিয়া ফেলে—নানির অসুখ করতে যাবে কেন ? শুধু তো মন খারাপ!

এক মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া ওঠে চিত্রলেখা। ওঃ, অসুখটা তবে ছল! ছলে বৌকে দেশে টানিয়া লইয়া যাইবার ছুতা! মায়ের উপর তবে ক্রুদ্ধ হইয়া ছেলেমেয়েদের লইয়া আসিয়াছেন মণীন্দ্র! প্রলয়গম্ভীর মুখের কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল। ভালোই হইয়াছে যে এতদিনে মায়ের স্বরূপ চিনিয়াছেন মণীন্দ্র। ভালো! ভালো! উভয় পক্ষই বেশ জব্দ হইয়াছেন। চাপা হাসি চাপিয়া ছোট্ট ছেলেটাকেই বিদ্রূপব্যঞ্জক ভঙ্গীতে শুধায় চিত্রলেখা—তা হঠাৎ তাঁর মন খারাপের কারণটা কি হলো ?

বাবার কাছে বলিয়া ফেলিবার ভয়ে সেখানে একটা নিষেধ ছিল বটে, কিন্তু

মায় কাছে বলিতে আলাদা করিয়া কোন নিষেধের অর্ডার পাওয়া যায় নাই, তাই সিদ্ধার্থ সোৎসাহে বলে—তা মন খারাপ হবে না—দিদির বিয়ে হয়ে গেল—তোমরা দেখতে পেলে না, কিছু উৎসব হলো না—নেমন্তন্ন হলো না।

ছেলেটা নিতান্ত মেল ট্রেনের গতিতে কথা কয় বলিয়াই এতগুলো কথা বলিয়া ফেলিতে পারে, কারণ প্রথমাংশটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হইয়া উঠিয়াছে চিত্রলেখা।

—কী বললি ? কী হয়ে গেল ? দিদির কী হয়ে গেল ?

মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া উৎসাহটা নিতান্তই স্তিমিত হইয়া পড়ে বেচারায়। ভয়ে ভয়ে বলে—দিদির হঠাৎ বিয়ে হলো কিনা। সেই বুড়ো ভদ্দরলোক তাড়াতাড়ি মরে গেল যে—আজ বিয়ে হলো—কাল মরে গেল—ব্যস্।

চিত্রলেখা আর সিদ্ধার্থর কাছে দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। হার্টের অসুখ ভুলিয়া বিদ্যুৎবেগে মণীন্দ্রর বসিবার ঘরে আসিয়া দাঁড়ায়।

ট্রেনের পোশাক সেইমাত্র ছাড়িয়া বসিয়াছেন তিনি।

—পিতাপুত্রী দু'জনেই আছেন—চমৎকার !

বিদ্যুতের মত আসিয়া বাজের মত ফাটিয়া পড়াই সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই প্রশ্নটা বাজের মত শোনায়—ব্যাপারটা কি হয়েছে শুনতে পারি ?

মণীন্দ্র গম্ভীর ভাবে একবার সেই অগ্নিময় মুখচ্ছবির পানে চাহিয়া ধীরস্বরে বলেন—শোনবার মত নয়।

—বলতে লজ্জা করছে না ? প্রকৃত ঘটনা শিগ্‌গির বলো আমায়, কি ভেবেছো কি তোমরা ?

—প্রকৃত ঘটনা—আমি যতটুকু জানি তা এই—একজনের প্ররোচনায় পড়ে মা বেবির একটা বিয়ে দিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন···বেবি, তুমি ওপরে যাও, অভীর সঙ্গে খেলা করগে।

চিত্রলেখার লিপ্‌স্টিক রঞ্জিত ওষ্ঠাধরের পথ বাহিয়া যে লাভাস্রোত প্রবাহিত হইবে, সেটা কল্পনা করিয়া বোধ করি বালিকা কন্যার জন্য করুণা হইল মণীন্দ্রর। কিন্তু চিত্রলেখা অত ভাবপ্রবণ নয়, তাই চিলের মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ওঠে—না, উঠে যাবে না ও, সমস্ত পরিষ্কার শুনতে চাই আমি। জেনে রাখো, তোমার মা'র এসব স্বেচ্ছাচার কিছুতে সহ্য করবো না। তোমার মা

বলে রেহাই দেব না।

—কি করবে? মার নামে চার্জ্জসীট আনবে?

—দরকার হলে তাও করতে কুণ্ঠিত হবো না এটা জেনো।···এই বেবি, সরে আয় এদিকে, সরে আয় বলছি—সিঁদুর পরেছিস্! লজ্জা করছে না? উঠে আয় বলছি!

সিন্দূররেখা একটু ছিল বৈকি, নবোঢ়ার গৌরবদীপ্ত উজ্জ্বল রেখা নয়, ভীরু কুণ্ঠিত ক্ষীণ একটু আভাস···চিত্রলেখার রুমালের ঘর্ষণে সেটুকু মুছিয়া যায়—শুধু একটু বেদনাময় আভাস রাখিয়া।

তাপসী অমন শুষ্ক চোখে তাকাইয়া থাকে কেমন করিয়া? ঘন পল্লব বেষ্টিত বড় বড় দুই চোখের বড় বড় জলের ফোঁটাগুলি হারাইয়া গেল কোথায়? শুকনো পাংশুমুখে চোখ দুইটা বড় বেমানান দেখিতে লাগে।

—যাও সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলো গে, আর দ্বিতীয় দিন যেন এসব অসভ্যতা দেখতে পাই না।

মায়ের আদেশে অন্ততঃ এইটুকু উপকার হয় তাপসীর, মায়ের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার একটা ছুতা পায়।

মণীন্দ্র একটু তিক্ত হাসির সঙ্গে বলেন—চিহ্নটা মুছে ফেলতে পারো—ঘটনাটা তো মুছে ফেলবার নয়।

বিরক্তিটা কেবলমাত্র চিত্রলেখার ওপরই নয়, মায়ের উপর—হয়তো বা নিজের ভাগ্যেরও উপর।

চিত্রলেখা মুহূর্ত্তে জলিয়া উঠিয়া উত্তর করে—তুমি কি আশা করছো এই খেলাঘরের রাবিশ্ বিয়ে আমি সমর্থন করবো?

—খেলাঘরের আর কি করে বলা চলে? অনুষ্ঠানের তো কিছুই ত্রুটি হয়নি শুনলাম—কুশণ্ডিকা সপ্তপদী পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।

—কন্যা সম্প্রদান বলে একটা কথা আছে না? তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার মেয়েকে সম্প্রদান করা হয় কোন্ আইনে? কোন্ অধিকারের বলে অপর কারো পক্ষে এ কাজ সম্ভব হয়?

—হিন্দু আইনের বলেই হয়। আমার পরিবর্ত্তে আমার মা কন্যা সম্প্রদান করলে সেটা আইনের চক্ষে অসিদ্ধ নয় চিত্রা।

—তা হলে তুমি এটাকে বিয়ে বলে মেনে নিতে চাও?

—উপায় কি! ওপরে যতই ময়ূরপুচ্ছ এঁটে বেড়াই, ভেতরে স্রো

ছাড়া আর কিছুই নই আমরা। অগ্নি-শালগ্রাম সাক্ষ্য করা হিন্দু বিবাহ নাকচ করে দেব কিসের জোরে ?

—কিসের জোরে নাকচ করা যায় সে তোমাকে শেখাবার রুচি নেই, কিন্তু কি করে করা যায় দেখিয়ে দেবো জেনো। বেবির যদি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বিয়ে আমি না দিই; তাহলে আমি—, সভ্যতা ভব্যতা এবং আধুনিকতার বহির্ভূত কটু একটা দিব্যি উচ্চারণ করিয়া ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া গেল চিত্রলেখা।

মণীন্দ্রর নিষ্ঠুরের মত চলিয়া যাওয়ার পর হেমপ্রভা প্রথমটা বজ্রাহতের মতই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, ক্রমশঃ নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইলেন। ভালোই হইল যে মায়ার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতে ভগবান এমন করিয়া সাহায্য করিলেন। কি মিথ্যার উপরই প্রাসাদ গড়িয়া বাস করা! সে প্রাসাদ যদি ভাঙিয়া পড়ে তো পড়ুক, হয়তো ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ সেটা।

পয়সার খোঁটাটাই বড় কঠিন হইয়া বাজিয়াছে।

পয়সার লোভে হেমপ্রভা একটা অসঙ্গত কাজ করিয়া বসিতে পারেন—এত অনায়াসে এত বড় কথাটা উচ্চারণ করিল মণীন্দ্র! ছেলের উপর দুরন্ত অভিমানটা বৈরাগ্যের বেশে আসিয়া দেখা দেয়।

নিজের দিকটাই এত বড় হইয়া উঠিল। মায়ের মনের দিকটা একবার তাকাইয়া দেখিল না! কী লজ্জায় কুণ্ঠায় মরমে মরিয়া আছেন তিনি, সেটা অনুভব করিবার চেষ্টা মাত্র করিল না! যা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার তো চারা নাই, কিন্তু এত অগ্রাহ্য করিয়াই বা লাভ কি? একেবারে স্থির বিশ্বাস করিয়া বসিলে—অপাত্র! নিজেই একবার দেখাশোনা করো, ম্লেচ্ছ খৃষ্টান নও যে মেয়ের আবার বিবাহ দিবে! অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া অনেকে তো ছেলেকে জামাইকে বিলাতেও পাঠায়। তাই কেন মনে করো না? না-হয় পাঁচ-সাত বৎসর ছাড়াছাড়িই থাকত?—বারো বছরের মেয়ের যৌবন আসিতে কত যুগ লাগে? পরিপুষ্ট গঠনভঙ্গির ভিতর এখনই কি ছোঁয়াচ লাগে নাই তার?

আচ্ছা বেশ, ফ্যাশানের দায় চাপাইয়া নবযৌবনা কন্যাকে শিশু করিয়া রাখো—কিন্তু হেমপ্রভা যদি মনে-প্রাণে নিষ্পাপ থাকিয়া থাকেন, একদিন সন্দেহের ভুল বুঝিতে হইবে তোমাদের।

ভগবানের কাছে বার বার প্রার্থনা করিতে থাকেন হেমপ্রভা—অগ্রাহ্য

অবহেলায় যার নামটা পর্য্যন্ত শুনিতে রুচি করিল না মণীন্দ্র, সেই ছেলেই যেন শিক্ষায়দীক্ষায় চরিত্র-গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, লোভনীয় হইয়া ওঠে।—নিতান্তই বড় স্নেহের তাপসীর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত তাই, তা নয়তো—হয়তো হেমপ্রভা অভিসম্পাত দিয়া বসিতেন—সেই লোভনীয় বস্তুর পানে চাহিয়া যেন একদিন অনুতাপের নিশ্বাস ফেলিতে হয় মণীন্দ্রকে—চিত্রলেখাকে।···না থাক্, হেমপ্রভা কায়মনে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—তাপসীর ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়। তবে হেমপ্রভা এবার সরিয়া যাইতে চান।

নিজস্ব সমস্ত সম্পত্তি তাপসীর নামে দানপত্র করিয়া দিয়া হেমপ্রভা আষাঢ়ের এক বর্ষণমুখর রাত্রে সর্ব্বতীর্থসার বারাণসীর উদ্দেশে রওনা হইয়া গেলেন।

কলিকাতার বাড়ীতে আর ফিরিলেন না।

তাপসীর উপর অনিচ্ছাকৃত যে অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহারই খেসারৎ স্বরূপ বোধ করি এই দানপত্র।

শাশুড়ীর আক্কেল দেখিয়া চিত্রলেখা আর একবার স্তম্ভিত হইল। এ কি ঘোর শত্রুতা! তা ছাড়া বেবিকে 'লায়েক' হইয়া উঠিবার আবার একটি সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল! একেই তো মেয়ে মায়ের তেমন বাধ্য নয়, আবার অতগুলো বিষয়-সম্পত্তির মালিক হইয়া উঠিলে রক্ষা থাকিবে?··· চিত্রলেখার বিরুদ্ধে এ যেন যুদ্ধ ঘোষণা হেমপ্রভার। শাশুড়ীর কাশীবাসের সংবাদে যথেষ্ট হৃষ্ট হইবার সুযোগ আর পাইল না বেচারা।

যাক্ তবু নিষ্কণ্টক।

এতদিনে চিত্রলেখা উঠিয়া পড়িয়া লাগে মেয়ে-ছেলেদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে। সদ্য দেখিয়া আসা সেজকাকীর ও তস্য ভগিনীর ছেলেমেয়েদের দৃষ্টান্ত তো আছেই, তা ছাড়া আছে চিরদিনের স্বপ্নসাধ।—শাশুড়ীর জ্বালায় যেটা সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পায় নাই।

গভীর রাত্রে রাত্রি জাগিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে—না প্রেমালাপ নয়—তর্ক হইতেছিল।

চিত্রলেখার স্বর স্বভাব-অনুযায়ী তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণু, মণীন্দ্র গম্ভীর কিন্তু কতকটা যেন অসহায়। তর্কের বস্তু তাপসী। মণীন্দ্রর ধারণা—তাপসী ছেলেমানুষ হইলেও বিবাহ ব্যাপারটায় তার মনে হয়তো কিছুটা রেখাপাত করিয়াছে

রেখা সিঁথির সিঁদুর রেখার মত অত সহজে মুছিয়া ফেলা বোধ হয় সম্ভব নয়। চিত্রলেখার হিসাবে হয়তো ভুল আছে, মেয়েকে অতি আধুনিক করিয়া গড়িয়া তুলিয়া যথাসময়ে যথার্থ বিবাহের জন্য প্রস্তুত করিবার ইচ্ছাটা একটু যেন অসঙ্গত জেদের মত। কিন্তু চিত্রলেখার কথার উপর তেমন জোর দিয়া কথা বলার ক্ষমতা মণীন্দ্রর কই?

তাই দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলেন—হয়তো শেষ পর্য্যন্ত সেই বিবাহটাকেই মেনে নিতে হবে। অবশ্য এখন নয়—যাক্ দু'চার বছর—হয়তো ছেলেটা—

চিত্রলেখা এতক্ষণ নিজের খাটেই ছিল, কিন্তু এখন সঙ্গীন অবস্থায় অত দূর পাল্লা হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ কার্য্যকরী না হওয়ার আশঙ্কায় উঠিয়া আসিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া স্বামীর বদলে বালিশের উপর একটি প্রবল 'চাপড়' বসাইয়া তিক্ত তীক্ষ্ণ স্বরে বলে—কী, সেই জোচ্চোরদের সঙ্গে আপস করে? তার চেয়ে মনে করব বেবি বিধবা, গোড়া হিন্দুঘরের বালবিধবা!

--ছি চিত্রা!

—ছি আবার কিসের? আমার কাছে এই সাফ কথা। তোমাদের সেই পুতুলখেলার বিয়ের বর যদি রাজপুত্তুরও হয়, সে বিয়ে আমি মানবো না, মানবো না, মানবো না। তোমার মার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে কিছুতেই হার মানবো না।

—দেখ, মার হয়ে ওকালতি করতে চাইছি না আমি, কিন্তু ভেবে দেখ, বেবির মনের ওপর যদি এর কোন প্রভাব পড়ে থাকে—

—তোমার কথা শুনলে আমার সুইসাইড করতে ইচ্ছে করে। ওইটুকু একটা বাচ্ছা—দুধের শিশু বললেও হয়, দুনিয়ার কিছুই যে জানে না—তার বিষয়ে এসব কথা ভাবো কি করে তাই আশ্চর্য! ওর আবার মন, তার ওপর আবার প্রভাব! একটা চকোলেটের ভাগ নিয়ে অভীর সঙ্গে বাবলুর সঙ্গে খুনসুড়ি করে—

—তা করুক। শুনতে পাই—পৃথিবীতে আমার শুভ জন্মদিনে আমার মা সারাদিন নাকি কেঁদেছিলেন একটি মাটির পুতুলের বিয়োগ-ব্যথায়।

—থাক্ থাক্, প্রত্যেক বিষয়ে তোমার মার উদাহরণ শোনবার শখ আমার নেই। ওঁদের আমলের মত অকালপক্ক ছেলেমেয়ে এখনকার নয়। নিশ্চয় জেনো, সেই বাজে ব্যাপারটা বেবি মোটেই মনে করে নেই। এবং যাতে আর কখনো মনে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।—যাক্ সে কথা, বেবির

জন্যে যে টিউটরের কথা বলেছিলাম তার কি করছো? ম্যাথামেটিক্সে কি যাচ্ছেতাই কাঁচা ও—তার খেয়াল রাখো?

—খেয়াল! আমি আব কি রাখবো? তুমিই তো—কিন্তু কি যেন নাম ভদ্রলোকের—হিমাংশু বুঝি, তা তিনি কি আর পড়াবেন না?

—আঃ, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া একটা বিরক্তিকব ব্যাপাব। সেদিন অত কথা বললাম, সব ভুলে গেছো! হিমাংশুবাবু ইংলিশটা ছাড়া আব কিছু ভালো কবে দেখেন না। অবশ্য সেইটাই প্রধান তা জানি, কিন্তু কোন কিছুতেই কাঁচা থাকবে তা চাই না আমি।

—বেশ তো, ওঁকে নয় বলে দেখবো সপ্তাহে চাবদিন না এসে যদি ছ'দিন অন্ততঃ আসেন! অবশ্য 'পে'টা কিছু বাড়াতে হবে—

—না।

—না মানে?

—'না' মানে না। ওর আব কোন মানে নেই। ছোটলোকের মত যে একই টিউটর ইংলিশ দেখবে--ম্যাথমেটিকস্ দেখবে—হিস্ট্রী, জিওগ্রাফী, বেঙ্গলী, গ্রামার সবই দেখবে—এটা অসম্ভব জঘন্য লাগে। তা হলে বাবলু অভীরই বা আলাদা টিউটবেব দরকার কি—সাধাবণ কেবানী বাড়ীর মত একটা টিউটর এসে তিনজনকে ধরে সবগুলো সাবজেক্টের মিক্সচার খানিকটা গিলিয়ে দিয়ে গেলেই চমৎকার হয়।

—সে কথা হচ্ছে না। মণীন্দ্র হতাশ ভঙ্গীতে বলেন—ও বেচারা আর কখন সময় পাবে? সপ্তাহের মধ্যে তিনদিন তো তোমার গান-বাজনা-এস্রাজ আর ডান্সিং মাস্টারের নিষ্ঠুরতা—বাকি চারদিন তো হিমাংশুবাবুই আছেন। সপ্তাহটা তো রবারের নয় যে টেনেটুনে বাড়িয়ে নেবে!

—কেন সকালে? রুটিন হিসেবে চললে অনায়াসেই এক ঘণ্টা করে সময় বের করা যায়!

—সকালে? আহা!

—এই সব বাজে সেন্টিমেন্টের কোন মানে হয় না। 'আহা' কিসের? এই তো শিক্ষার সময়। জগতে যা কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে সবগুলোই দেখতে হবে চেষ্টা করে। এত সুযোগ থাকতে—

মণীন্দ্রনাথ মনে মনে বলেন—নিজের জীবনের সুযোগের অভাবই বোধ করি তোমাকে এমন জ্ঞানী করিয়া তুলিয়াছে! মুখে বলিতে সাহস পান না, শু

ভাবিতে চেষ্টা করেন—চিত্রলেখার ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটিলে মণীন্দ্রর নিজের ভাগ্যে কি ঘটিত!

মেয়েকে সর্ব্ববিদ্যা-পটিয়সী করিয়া তুলিবার দুরন্ত সাধনায় মেয়ের জীবনটা চিত্রলেখা দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া ভারি একটা ক্ষোভ ছিল মণীন্দ্রর, কিন্তু সহসা একদিন মেয়েরই এক নূতনতর আবদারে 'তাক' লাগিয়া গেল তাঁহার।

সপ্তাহের সব কয়টা দিনকে রবারের মত টানিয়া টুনিয়া বাড়াইবার অপূর্ব কৌশল আয়ত্ত করিলেও, রবিবারের সকালটাকে উদার ঔদাসীন্যে বাদ দিয়া রাখিয়াছিল চিত্রলেখা। সেই দুর্লভ ক্ষণটুকুকেও কাজে লাগাইবার বাসনা লইয়া বাবার দরবারে আসিয়া হাজির হইল বেবি।

মায়ের কাছে তাহার সব বিষয়েই কুণ্ঠা, বাবার কাছে নিশ্চিত প্রশ্রয়ের নিশ্চিন্ততা। অতএব জগতের যাবতীয় শিক্ষণীয় বস্তু সম্বন্ধে মায়ের যতই উৎসাহ থাক, বেবি আসিয়া বাবাকেই ধরিয়া পড়িল—সে গাড়ী চালানো শিখিবে।

মেয়ের অভিনব ইচ্ছায় সস্নেহ হাসি হাসিয়া মণীন্দ্র কহিলেন—কেন বলো তো? অক্ষয় বিটায়ার করতে চায় নাকি?

তাপসী হাসিয়া বাবার চেয়ার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলে—বাঃ, তা কেন? শিখে রাখা ভালো নয় বুঝি? মোটর-ড্রাইভিং শেখে না মানুষ?

বলা বাহুল্য, বাবার দরবারে আবেদন করিবার কালে একটু নির্জ্জন অবসরের জন্য যতই চেষ্টা করুক বেচারা, অমিতাভ তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। দিদির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বলিয়া উঠে—মানুষরা শেখে নিশ্চয়ই, দরকারও আছে শিখে রাখবার, মেয়েমানুষে শিখতে যাবে কি জন্যে?

—অভী, আবার? তীব্র নয়নে অগ্নি হানিয়া দিদি সরোষে বাবার কাছে অভিযোগ করে—বাবা দেখছো? অভী আবার আমাকে 'মেয়েমানুষ' বলে ঠাট্টা করছে!

অর্থাৎ বোঝা যায় ঠাট্টাটা পূর্ব্ব-নিষিদ্ধ।

কিন্তু অমিতাভ কিছুমাত্র দমে না। সজোরে বলে—যে যা, তাকে তাই বললে ঠাট্টা হয় বুঝি? আমাকে 'পুরুষমানুষ' বলো না, কিছুই রাগ করবো না আমি। যা সত্যি তা বলতে দোষের কি আছে?

তাপসী নিরুপায় আক্রোশে উত্তেজিত হইয়া বলে—কেন থাকবে না?

কানাকে 'কানা' বললে দোষ হয় না? খোঁড়াকে 'খোঁড়া' বললে দোষ হয় না? গরীবকে—

অমিতাভর সহসা সশব্দ হাসিতে সব উদাহরণগুলা আর দাখিল করা সম্ভব হয় না তাপসীর পক্ষে।

মণীন্দ্রও অবশ্য মেয়ের যুক্তির মৌলিকত্বে হাসিয়া ফেলিয়াছেন, তবু দুর্ব্বলের পক্ষগ্রহণ নীতির বশে ছেলের হাসির প্রতিবাদ করেন—বা রে অভী, হাসছো কেন তুমি? ঠিকই তো বলেছে বেবি। মেয়েদের 'মেয়ে' বললে তোমার মা চটেন না?

—মা তো সব তাতেই চটেন। মার কথা বাদ দাও।···মা সম্বন্ধে এই নির্ভীক মন্তব্যটি উচ্চারণ করিয়া অমিতাভ নিতান্ত বিচক্ষণের মত বলে—আমি শুধু বলছি, দিদি এই বুদ্ধি নিয়ে গাড়ী চালালে প্রত্যেক দিনই তো অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটাবে!

—কেন রে শুনি? মেয়েদের গাড়ী চালাতে দেখিস্‌নি কখনো? রোজ অ্যাক্সিডেণ্ট করে তারা? তাপসী এবার নিজেই হাল ধরে।

—তারা তোর মত হাঁদা মেয়ে নয়। তোর পক্ষে ওই পিড়িং পিড়িং সেতার বাজানো, আর 'চিঁ চিঁ' করে গান শেখাই ভালো।

মণীন্দ্র সকৌতুক হাস্যে ছেলেমেয়েদের এই বাগ্‌বিতণ্ডা উপভোগ করিতেছিলেন। এবার হাসিয়া বলেন—'ওঃ, তাহলে অভীবাবুর মতে গান-বাজনা শেখা হাঁদাদের উপযুক্ত কাজ! আমার তো তা ধারণা ছিল না!

অভী বেকায়দায় পড়িয়া ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বলে—তা কেন? দিদির মত মেয়ে আর কি করবে—

—সবই করবে। মণীন্দ্র সস্নেহ গাম্ভীর্য্যে বলেন—ইচ্ছে করলে চেষ্টা থাকলে সবাই সব করতে পারে, বুঝলে অভী? মেয়েছেলে বলে তফাৎ করবার কিছু নেই। হয়তো এমন হতে পারে বেবি তোমার চাইতে ভালো ড্রাইভিং শিখবে!

অমিতাভ একটা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া দিদির দিকে দৃষ্টিপাত করে। অর্থাৎ 'ওই আনন্দেই থাকো'!

মণীন্দ্র মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলেন—কিন্তু সপ্তাহে তো ওই একবেলা মাত্র ছুটি তোমার, সেটুকুও খরচ করে ফেলতে চাইছো?

বেবি সোৎসাহে বলে—ওতে তো ছুটির মতই মজা, ছুটির চেয়েও ভালো। মাকে বলে-টলে ঠিক করে দাও না বাবা।

—হ্যাঁ, ওই একটা দিক আছে বটে। দেখি তিনি কি বলেন!

অমিতাভ নিশ্চিন্ত স্বরে বলে— কি আর বলবেন, মা তো ওই চান, খালি ফ্যাসন শিখুক মেয়েটি। হ্যাঁ, যদি আমি বলতাম—তাহলে ঠিক বলতেন—'এখন তোমার লেখাপড়ার সময়, এখন ওসব থাক্।'

নিজের কণ্ঠস্বরে মায়ের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য্য নকল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

—কিন্তু শেখাচ্ছে কে? অক্ষয়? রাজী হবে তো? মানে সময় হবে তার?

বেবি আগ্রহ-চঞ্চল স্বরে বলিয়া ওঠে—খুব খুব। অক্ষয়কে তো বলে-টলে ঠিক করে রেখেছি। শুধু মার মত হলেই—

মাঝপথে কথা থামিয়া যায় স্বয়ং মাতৃদেবীর আবির্ভাবে।

কথা থামাইয়া বাবার চেয়ারটার সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায় তাপসী, ভীত-চঞ্চল দুটি দৃষ্টি মেলিয়া।

—কি? কিসের পরামর্শ হচ্ছে তোমাদের?

—বিশেষ কিছু না। মণীন্দ্র নিতান্ত লঘুভাবে বলেন—বেবির শখ হয়েছে গাড়ী চালাতে শিখবে, তাই—

চিত্রলেখা শ্লেষ-মিশ্রিত একটু হাসির সঙ্গে বলেন—তবু ভালো! তোমার মেয়ের 'শখ' বলে জিনিসটা আছে তাহলে? আমি তো জানি সবই আমার শখে করতে হয়।...শেখাচ্ছে কে? তুমি নাকি?

—আমি? তবেই হয়েছে! অক্ষয় আমার অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছে। ওই অক্ষয়ই শেখাবে। অবশ্য অভীর মতে—

—থাক্ থাক্, বালক-বৃদ্ধ সকলের মতামত শোনবার সময় আমার নেই। আমি বলতে এসেছিলাম—

কথার মাঝখানে একঝলক কাল-বৈশাখী ঝড়ের মত ছুটিয়া আসে সিদ্ধার্থ।

—দাদা, দিদি, তোমরা এখানে? ওদিকে দেখগে যাও কি মজা হচ্ছে! অক্ষয় একটা পাখী ধরেছে—একদম সবুজ। কি সুন্দর লাল লাল পা! একটা ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে এখন কঞ্চি দিয়ে খাঁচা বানাচ্ছে। আমি ধরছিলাম—তোমরা দেখতে পাবে না বলে একবারটি শুধু—আসবে তো এসো!

অমিতাভ অবশ্য 'একদম সবুজ' পর্য্যন্তও দাঁড়াইয়া শুনিবার অপেক্ষা রাখে নাই। সংবাদদাতার সংবাদ-দান কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার আগেই ঘটনাস্থল উদ্দেশে দৌড়াইয়াছে। বেবিও নিজেকে সামলাইতে পারে নাই। সিদ্ধার্থর সঙ্গে সঙ্গে সেও প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

অক্ষয় ওদের অনেক দিনের লোক।

অধস্তন ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা চিত্রলেখার অত্যন্ত অপছন্দকর হইলেও অক্ষয় সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের ঠিক আঁটিয়া উঠিতে পারে না—"অক্ষয়টি হচ্ছে এদের দুষ্টু বুদ্ধির যোগানদার" এর বেশী আর কিছু বলা হয় না।

স্বামীর ঘরে আসিয়া পর্য্যন্ত অক্ষয়কে দেখিতেছে সে। স্বামীরও পুরনো লোক বলিয়া কেমন যে একটা সমীহ ভাব, দেখিলে হাসিও পায়, গাও জ্বালা করে। গ্রাম্য মনোভাব আর কি!

চিত্রলেখার ভাগ্যের সবদিকেই যেন কাঁটা ঘেরা। পাগড়ীধারী ৮'ফুট পাঞ্জাবী ড্রাইভার-সম্বলিত গাড়ীর চেহারা কেমন আভিজাত্যপূর্ণ!...সে জায়গায় আধময়লা ছিটের শার্ট পরা বেঁটে খাটো অক্ষয়!

ছি!

স্ত্রীর মুখের উপরকার নানা বর্ণের খেলা বোধ করি মণীন্দ্রর চোখে পড়ে না। হালকা সুরে বলেন—বোধ ভাবনায় পড়েছে তোমার পাছে আপত্তি হয়। আপত্তির আর কি আছে, এঁ্যা! ছেলেমানুষের শখ—ক'দিন আর টিঁকবে?

মেয়ের হইয়া ওকালতির প্রয়োজন খুব বেশী ছিল না অবশ্য।

চিত্রলেখার আপত্তি হইবার কথা নয়। তবে প্রস্তাবটা অপর পক্ষ হইতে আসায় বেশী উৎসাহ প্রকাশ করা যায় না এই যা।

নিজে যে বিশেষ কিছুই শিখিতে পায় নাই, এই একটা দারুণ ক্ষোভ, মাঝে মাঝে নিজের সন্তানদের উপরও কেমন যেন ঈর্ষান্বিত করিয়া তোলে।

ছবি ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার পর অন্য একটা কথার ছুতা ধরিয়া স্বামীর সঙ্গে কথা-কথাকাটি করিয়া উঠিয়া যায় এবং মেয়ের এই শখের প্রস্তাবের স্বপক্ষেই বা কতটুকু রায় দেওয়া যায় এবং বিপক্ষেই বা কি কি যুক্তি দেখানো চলে, মনে মনে তাহার হিসাব করিতে থাকে।

স্বামীর সংসারে আসিয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত লড়াই করিতে করিতে স্বভাবটাই কেমন যেন 'রণং দেহি' গোছের হইয়া গিয়াছে তাহার।

বুড়ী এক শাশুড়ী, আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বামীর হাতে পড়িয়া জীবনটাই মিথ্যা হইয়া গেল।

বাহির হইতে মণীন্দ্রকে যতই অনুগত আর পত্নীসর্ব্বস্ব দেখাক, আসলে যে সেটা কত ভুয়ো, চিত্রলেখার মত এমন মর্ম্মান্তিক করিয়া আর কে জানে?

অথচ অদৃশ্য বস্তুর সঙ্গে লড়াই চলে না।

মণীন্দ্রর বাহিরের ভঙ্গীটা নিতান্তই আত্মসর্পণের ভঙ্গী।

তাই না এত জ্বালা চিত্রলেখার!

মেয়েকে 'চৌকস' করিয়া তুলিবার সাধটা নিজেরই নিতান্ত প্রবল বলিয়া মেয়ের সাধের স্বপক্ষেই রায় দিতে হয় চিত্রলেখাকে। অবশ্য অনেকগুলি শর্তাধীনে নিমরাজী ভাব দেখাইয়া।

সম্মতি দেওয়ার পর আর চুলের ডগা দেখিতে পাওয়া যায় না মেয়ের।

মনে হয় যেন হাওয়ায় ভাসিতেছে।...যাক মন্দের ভালো! সবটাই তো বুড়ীর মত, এক্টা বিষয়েও তবু প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে!

নির্দ্দিষ্ট দিনে বেবি অভী গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অক্ষয় ভালো-মানুষের মত পিছনদিকে উঠিয়া বসে। যেন তাহার আর কোনো কাজ নাই, হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া যাইবে।

—ও কি, তুমি ভেতরে বসলে যে? তাপসী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

—কেন আজ তো তুমি চালাবে, আমার ছুটি।

—বাঃ, আমি তো সবে আজ থেকে শিখবো! আমি বুঝি চালাতে পারি?

—ওঃ, তাই বুঝি! আমি ভাবছি বেবিদিদি আজ আমাকে ছুটি দিয়ে দিলে!

—ইস, ভারি তো কাজ, আমি খুব পারি। অমিতাভ সগর্ব্বে চালকের আসনে উঠিয়া বসে এবং ষ্টীয়ারিংয়ে হাত দিয়া গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে—লাইসেন্স যে নেই, ওই তো হয়েছে মুস্কিল!

—এই অভী, দুষ্টু ছেলে—যা ভেতরে বস্‌গে যা, আজকে আমি শিখবো। অক্ষয় এসো না লক্ষ্মীটি, এখুনি হয়তো মা'র মত বদলে যাবে!

—বা রে, আমি শিখবো না বুঝি? অমিতাভ প্রায় দিদির মতই নাকিস্বর তোলে—মেয়েদের তো ভারি দরকার, শুধু শখ! ছেলেদেরই তো—

—আরে তুমি আবার শিখবে কি, তোমার তো সব শেখাই আছে। অক্ষয় হাসিতে হাসিতে স্বস্থানে আসিয়া বসে। বলে—বেবিদিদি এসো!

আগে 'বেবিই' বলিত, আজকাল কি ভাবিয়া কে জানে 'দিদিটা' যোগ দিয়াছে। অমিতাভ অনিচ্ছামন্থর গতিতে পিছনের 'সীটে' এবং তাপসী মহোৎসাহে সামনের 'সীটে' উঠিয়া বসে।

—আজ শুধু দেখে নাও মন দিয়ে, বুঝলে? কোন্ দিকে যাবো?

—কেন, রেস কোর্সে! অমিতাভ ফোড়ন দিয়া ওঠে—ওখানেই তো চক্কর দেওয়ার সুবিধে।

—তা কেন? তাপসী ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি জানায়—তার চাইতে এমনি যেদিকে ইচ্ছে—

—হ্যাঁ যেদিকে ইচ্ছে, অমিতাভ পুরুষোচিত তীব্রকণ্ঠে মন্তব্য করে—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেতে হবে নাকি? অক্ষয় তুমি দিদির কথা শুনো না, ওর যদি কোনো বুদ্ধি আছে!

—না, কোনো বুদ্ধি নেই, যত বুদ্ধি তোর মাথায় ভরা আছে! তাপসী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—কলকাতার সব কিছুই বুঝি আমরা দেখেছি! এই যে, কলকাতায় ক'টা কলেজ আছে জানিস? দেখেছিস্ সব?

—কলেজ? আহা রে! কী একেবারে দ্রষ্টব্য জায়গা! তার চেয়ে বললি না কেন দিদি, কলকাতায় ক'টা গোয়াল আছে তাই দেখে বেড়াই!

তাপসীর কণ্ঠ আবার স্তিমিত হইয়া আসে—গোয়াল আর কলেজ এক হলো? খুব তো বুদ্ধি! ম্যাট্রিক দেবার পর আমাকে বুঝি পড়তে হবে না?

—তাই এখন থেকে দরজা চিনে রাখবি?

ভাইবোনের বাগ্‌বিতণ্ডার অবসরে গাড়ী অনেক দূর অগ্রসর হইতে থাকে।

—এই তো এসে গেল প্রেসিডেন্সী কলেজ! অক্ষয় মন্তব্য করে।

তাপসী চ্যালেঞ্জের সুরে বলে—আচ্ছা অভী, বল্ তো, প্রেসিডেন্সী কলেজে কত স্টুডেন্ট আছে?

—কত? ইঃ, কে না জানে! পাঁচশো!

বলা বাহুল্য দিদির কাছে খাটো হইবার ভয়ে ভাবনা-চিন্তার অপেক্ষা না রাখিয়াই উত্তর দিয়া বসে অমিতাভ।

সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলে, তাপসী যথেচ্ছ হাসিয়া ওঠে।

—খুব বলেছিস্! আমি বলছি এক হাজার কিংবা দু হাজার।—এই, এই অক্ষয়, থামাও তো গাড়িটা, একটু দাঁড়িয়ে থাকলেই তো দেখা যাবে কত ছেলে আসবে। দশটা বাজবে তো এখুনি!

—আজ আর দশটা বাজবে না বেবিদিদি! অক্ষয় ভাইবোনের তর্ককলহটা উপভোগ করিতে করিতে সহাস্যে বলে—আজ যে রবিবার!

রবিবার! রবিবার! ওঃ তাই তো! এই প্রচণ্ড সত্যটা ভুলিয়া বসিয়াছিল তাপসী! কী আশ্চর্য্য!

—দিদি এবার পাগল হয়ে যাবে। অমিতাভ গম্ভীর মত ব্যক্ত করে—যা মাথার অবস্থা হচ্ছে দিন দিন! এখন ক্লাস নাইনে পড়েন, এখনই থেকে 'কলেজ

কলেজ'। উনি আবাব কলেজে পড়বার সময় হোস্টেলে থাকবেন, জানো অক্ষয় ?

—হ্যাঁ, থাকবো। বলেছি তোকে ?

—বললি না সেদিন। সেই যেদিন তোর গানের মাস্টারমশাই এলেন ন, বাগানে চলে গেলাম আমবা। বললি না ?

—হ্যাঁ, সে তো শুধু বলেছি, হোস্টেলে থাকলে বাড়ীর থেকে পড়া ভালো হয়। হয না অক্ষয় ? বাড়ীর মত তো গোলমাল নেই।

—কি কবে জানবো দিদি ? সাবধানে মোড় ঘুরিতে ঘুবিতে অক্ষয় উত্তব দেয—কলেজেও পড়ি নি, হোস্টেলেও থাকি নি—

—পড়লে না কেন ? অমিতাভ গম্ভীর ভাবে বলে—শিক্ষাই জীবনের মূলধন, বুঝলে ? অনেক অনেক পাস কবলেই উন্নতি কবতে পাবতে।

অক্ষয় ক্ষুণ্ণভাবে বলে—কই আব পড়তে পেলাম ভাই—বাপ ঠাকুর্দা-কাকা সবাই মারা গেল—

তাপসী উৎসুক ভাবে বলে—সবাই মাবা গেলে বুঝি পডা যায় না ? খুব মন খারাপ হযে যায ?

অক্ষয় হাসিয়া ফেলে—মন খারাপেব জন্যে নয় বে দিদি, টাকা লাগে না ?

—ওঃ, টাকা। ভারি যেন আশ্বস্ত ভাবে তাপসী বলে—অনেক অনেক টাকা থাকলে পডা যায তাহলে ?

—দিদি তুই থাম্। অমিতাভ বিরক্তস্বরে বলে—এমন বোকার মত কথা বলিস্ আজকাল, কোনো যদি মানে থাকে। অক্ষয় তার চেয়ে চল বরানগরে। একদিন তোমার বাড়ী দেখিয়ে আনবে বলেছিলে যে—

—আমার বাড়ী ? গরীবের বাড়ীর আর কি দেখবে অভীবাবু, তোমার মা শুনলে বাগ করবেন।

—মা তো সব শুনলেই রাগ করেন, ছেড়ে দাও মায়ের কথা। চলো তুমি।

গাড়ী চলিতে থাকে।

তাপসী ম্লানমুখে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে থাকিতে একসময় বলে—অভী, তুই এদিকে এসে বোস্, আমার ভাল লাগছে না।

ছেলেমানুষের কণ্ঠে এমন শ্রান্তির সুর কেন ?

অক্ষয় চকিত ভাবে বলে—শরীর খারাপ লাগছে বেবিদিদি ? বাড়ী ফিরবে ?

—না-না, বাড়ী বিশ্রী।

'বিশ্রী' হইলেও একসময়ে ফিরিতেই হয় বাড়ীতে।

মণীন্দ্র সহাস্যমুখে বলেন—কী হলো তোমাদের? কতটা এগোলো?

—ছাই এগোলো! অমিতাভ বলে—দিদির শুধু মুখেই ওস্তাদি, শিখতে পারলে তো! খোলা জায়গায় গিয়ে তবে তো শিখতে হয়, তা নয় কি শখ, না কলকাতায় কটা কলেজ আছে দেখবো!

মণীন্দ্রনাথ চমকিয়া বলেন—কটা কি আছে?

—কলেজ। দু বছর পরে কবে পাস করবেন তাই এখন থেকে কলেজ দেখে বেড়াবেন! মা যেমন শাড়ীর দোকান দেখে বেড়ান—কোনটা পছন্দ হয় না, তাই না বাবা?

বাবা কিন্তু কথার উত্তর দেন না, তীক্ষ্ণভাবে একবার স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া থাকেন। কন্যার দর্শন মেলে না। কোথায় সে সরিয়া পড়িয়াছে পাত্তা পাওয়া যায় না।

অমিতাভ বাপের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতভঙ্গীতে বলিয়া চলে—দিদিটা আজকাল কী বোকাই হয়েছে বাবা! আজ রবিবার তা খেয়াল নেই, কলেজের ছেলে গুনতে বসছিলেন বাবু! আচ্ছা বাবা, প্রেসিডেন্সী কলেজে কত স্টুডেণ্ট আছে? দিদি বলছে এক হাজার! এত ছেলে কোথায় ধরে বাবা?

দিন যায়।

এইভাবেই বারে বারে ছোট ভাইয়ের কাছে অপদস্থ হইতে থাকে তাপসী। ছেলেমানুষ অমিতাভ সত্যই অক্ষয়ের কাছে বসিয়া প্রায় হাত পাকাইয়া ফেলে, আঃ লাইসেন্স পাইবার বয়স আসিতে আরো কত দিন লাগিবে, সনিঃশ্বাসে তাহার হিসাব কষিতে থাকে।

অথচ তাপসী গাড়ীতে উঠিয়াই অনর্থক শুধু এলোমেলো ঘুরাইয়া মারে অক্ষয়কে। কলিকাতার প্রত্যেকটি রাস্তাঘাট, প্রতিটি স্কুল-কলেজ, পার্ক, সিনেমা দেখিয়া বেড়াইবার কি যে এক বাজে খেয়াল চাপিয়াছে তাহার!

অমিতাভর সঙ্গে তর্কের বেলায় অবশ্য যুক্তি তারও আছে।

কলিকাতায় বাস করিয়া যদি কলিকাতার সব কিছু না দেখা হইল তবে আর গাড়ী থাকিয়া লাভ কি? কিন্তু একই জায়গা বার বার দেখিবার স্বপক্ষে আর যুক্তি যোগায় না তার, ছোট ভাইয়ের জেরার মুখে কাঁদিয়া ভাসায়।

চিত্রলেখা এত খবর রাখেন না, রাখেন মণীন্দ্র এবং কেন জানি না মনে মনে শঙ্কিত হইতে থাকেন।

বৎসর ঘুরিতে দেরি লাগে না। মণীন্দ্র ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন প্রস্তাব তুলিলেন—এবারে গ্রীষ্মের ছুটিতে মায়ের কাছে কাশী যাওয়া যাক। ছেলেরা তো এক পায়ে খাড়া, তাপসী অধীর আগ্রহে চিত্রলেখার মুখপানে চাহিয়া অপেক্ষা করে মা কী রায় দেন, কিন্তু চিত্রলেখা যেন এক ঝট্‌কায় সকলের উন্মুখ চিত্তকে তছনছ করিয়া দিলেন।

—আবার 'সামার ভেকেশনে' মার কাছে! বলতে লজ্জা করলো না তোমার? মুখে আটকালো না? বেশ যেতে পারো, কিন্তু মনে জেনো তার আগে পটাসিয়াম সায়ানাইড খাবো আমি। তারপর যা খুশী কোরো তোমরা।

অতএব কথাটা চাপা পড়িয়া যায়।

ঢিলে পায়জামা আর হাফশার্ট পরাইয়া মেয়েকে চিত্রলেখা ছেলেদের সঙ্গে সমান ভাবে মানুষ করিতে থাকেন আর নিজের বুদ্ধিগৌরবে উত্তরোত্তর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে থাকেন।

কাটিতে থাকে দিনরাত্রি।

সূর্য্য আর চন্দ্র নিজের নিয়মে আবর্তিত হইতে থাকে। বয়স বাড়িতে থাকে পৃথিবীর—বাড়িতে থাকে মানুষের। রাত্রির যবনিকা দিনের পৃথিবীকে ঢাকিয়া দেয়—মৃত্যুর যবনিকা মানুষকে ঢাকে।

কিন্তু পৃথিবীর জীবনে ঘটে নূতন সূর্য্যোদয়, ঘটে ঋতুচক্রের আবর্ত্তন। দীর্ঘ অবসরের সুযোগে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দেয় ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে রঙের সমারোহ—প্রজাপতির পাখনায় নিত্যনূতন বৈচিত্র্য। ত্রুটিহীন প্রকৃতি দেবীর প্রতিটি কাজ সমাপ্তি-মধুর।

হায়, মানুষ এখানে হার মানিয়াছে! তার জীবনে অবসর নাই, তাই ত্রুটিবহুল জীবনে তার সব কিছুই অসমাপ্ত।

মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মণীন্দ্রনাথ যত বেশী পীড়িত হইয়াছেন, তার

শতাংশের একাংশও যদি কার্য্যকরী হইতে, তবে হয়তো তাপসীর জীবনের ইতিহাস হইত অন্যরূপ। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না মণীন্দ্র, অনেক কিছু পরিকল্পনা মাথায় লইয়া হঠাৎ একদিন চির অন্ধকারের পথে পাড়ি দিলেন।

সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়া হেমপ্রভা কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখানেও ধীরে ধীরে কেমন করিয়া যেন গড়িয়া উঠিতেছিল নূতন সংসার। সংসার ভিন্ন আর কি? মানুষই সংসার। যাহারা মুখাপেক্ষী, যাহারা আশ্রিত, তাহাদের জন্য নিজের স্বামী-পুত্রের সংসারের মতই খাটিতে হয়, চিন্তা করিতে হয়। হেমপ্রভাকে কেন্দ্র করিয়া এমন একটি আশ্রিতের সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মা-বাপ-মরা যে ছেলে দুটি স্কুলে যায় তাহাদের আহারের তদ্বির সারিয়া হেমপ্রভা সবে গঙ্গার ঘাটে স্নানে গিয়াছেন, রাঁধুনী বামুনঠাকরুণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কহিল—মা চান হয়েছে? কলকেতা থেকে আপনাকে নিতে এসেছে!

—নিতে এসেছে? সে কি! কে?

—জানি না মা। নাম বললে লালবেহারী—

—হ্যাঁ, কলকাতার বাড়ীর সরকার—কি বলছে সে? অজানা একটা আশঙ্কায় বুকটা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে হেমপ্রভার।

—কিছু বলছে না—শুধু বলছে—"ঠাকুমাকে নিতে এসেছি"।

হেমপ্রভা আর প্রশ্ন করিতে সাহস করেন না। ধীরে ধীরে বাড়ী ফেরেন। বাহিরের ঘরে লালবিহারী বসিয়া ছিল চুপচাপ। হেমপ্রভা আসিয়া দাঁড়াইতেই পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

আপাততঃ সত্য খবর গোপন করিয়া মণীন্দ্রর সাংঘাতিক অসুখের ছুতায় হেমপ্রভাকে লইয়া যাইবার সংকল্পে মনে মনে কত কথা সাজাইয়া আসিয়াছিল, কিছুই বজায় রাখিতে পারে না, মেয়েমানুষের মত বিলাপ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

নাঃ, সন্দেহের আর অবকাশ নাই।

হেমপ্রভার জন্য চরম দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া গেল মণীন্দ্র। অপরাধের ভারে ভারাক্রান্ত হেমপ্রভা নিজেই তো নিজের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ড বাছিয়া লইয়াছিলেন, তবুও তৃপ্তি হইল না তাহার? আরো শাস্তির প্রয়োজন হইল?

কাঁদিলেন না, মূর্চ্ছা গেলেন না, কাঠের মত বসিয়া রহিলেন হেমপ্রভা, দেয়ালে পিঠ ঠেসাইয়া।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া লালবিহারী নিজেই স্থির হইল। চোখ মুছিয়া বলিল —আমার সঙ্গে যেতে হবে যে ঠাকুমা!

—যেতে হবে? হেমপ্রভা চমকিয়া উঠেন, কার কাছে লালবিহারী?

—মার কাছে, খোকা-খুকীদের কাছে, আমাদের কাছে। আপনি না গেলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো ঠাকুমা!

হেমপ্রভা এক মিনিট চুপ থাকিয়া বলেন—বৌমা কি আমাকে নিয়ে যেতে তোমায় পাঠিয়েছে লালবিহারী?

লালবিহারী ঢোঁক গিলিয়া বলে—তাঁর কি আর মাথার ঠিক আছে ঠাকুমা। পাঠিয়েছেন বৈকি, তিনিই তো খবর দেবার জন্যে—

হেমপ্রভা ম্লান হাসির সঙ্গে বলেন—খবর দিতে বলেছে তা জানি। বলবে বৈকি, সকলের আগে আমারই তো এ খবর পাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে আমি পারবো না লালবিহারী। বৌমাকে এ মুখ দেখাতে পারবো না আমি।

—কিন্তু ঠাকুমা, খোকা-খুকীদের—

—তাদের আর আমি কি করতে পারবো লালবিহারী? হয়তো অনিষ্টই করে বসবো।

সত্য কথা এই—চিত্রলেখা শুধু টেলিগ্রাম করিয়া দিবার হুকুম দিয়াছিলেন। লালবিহারী নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া সরাসরি চলিয়া আসিয়াছে।—হেমপ্রভার স্থির মুখভাব দেখিয়া আর ভরসা থাকে না তাহার, তবু কাতরভাবে বলে— তাহলে একলা ফিরে যাবো ঠাকুমা?

—একলাই তো সবাইকে ফিরতে হবে লালবিহারী।

হেমপ্রভা আর একবার ম্লান হাসেন।

আবার কিছুক্ষণ কাটে। একসময় বলেন—ওঠো লালবিহারী, স্নানটান করো, জল মুখে দাও।

লালবিহারী আর একবার হাহাকার করিয়া ওঠে—ও অনুরোধ আর করবেন না ঠাকুমা।

হেমপ্রভা স্থিরস্বরে বলেন—করবো বৈকি লালবিহারী, করতে তো হবেই। আমি নিজেই কি এখুনি স্নান-আহার করবো না? আজ না পারি, কাল করবো।—মণি যখন 'মা' বলে আমাকে এতটুকু দয়ামায়া করলো না, আমি

আবার কোন্ লজ্জায় অভিমান করবো, শোক করবো ?

যে বিবাহ ব্যাপারটাকে লইয়া এত কাণ্ড, তাপসী ভিন্ন আরও যে একটি অংশীদার আছে তাহার, সেকথা ভুলিয়া থাকিলেই বা চলিবে কেন ? বেচারা বুলুর দিকেও তো একবার চাহিতে হয় ! অগাধ অর্থের মালিক হইলেও মাতৃপিতৃহীন অসহায় কিশোর যেদিন জীবনের একমাত্র নির্ভরস্থল পিতামহকে অকস্মাৎ হারাইয়া বসিল, সেদিন সেই অগাধ অর্থের পানে চাহিয়া যে সে কিছুমাত্র ভরসা বোধ করিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই।

চারিদিকে চাহিয়া—একটা নিঃশ্বাসরোধকারী গুরুভার অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না তাহার !

স্বপ্নের মত কি যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে সে ছবিও স্পষ্ট মনে পড়ে না।—জানিয়া বুঝিয়া বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিবার মত বয়স তো তাহার নয়ই, তা ছাড়া সময়ও ছিল না। ব্যাপারটা যে সত্যই 'বিবাহ' এ বোধই কি জন্মিয়াছে ছাই !

বিবাহ এবং ঠাকুর্দার মৃত্যু—দুইটা অপ্রত্যাশিত বস্তু যেন তালগোল পাকাইয়া হঠাৎ হুড়মুড় শব্দে ঘাড়ে পড়িয়া গেল। নিঃশঙ্কে পথ চলিতে চলিতে যেন কোথা হইতে একটা পাহাড়ের চূড়া ঝড়ে উড়িয়া আসিয়া ঘাড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িয়াছে !

অপ্রত্যাশিত এত বড় আঘাতটায় মূঢ় বিপর্য্যস্ত দিশাহারা হইলেও তবু কান্তি মুখুজ্জের নাতি সে ! দিশাহারা হইলেও কর্ত্তব্যহারা হইল না। শ্রাদ্ধের আয়োজনে ত্রুটিমাত্র ঘটিল না, দানধ্যান, ব্রাহ্মণ-বিদায়, কাঙালী ভোজন, উচিত মতই হইল। অর্থবল, লোকবল, অভাব কিছুরই ছিল না, শুধু ইচ্ছা প্রকাশের অপেক্ষা।

নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করিবার সময় পিসি রাজলক্ষ্মী একবার কথাটা পাড়িলেন। বিবাহ যখন হইয়াছেই, উড়াইয়া দিবার তো উপায় নাই, শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৌ লইয়া আসুক বুলু। স্বামী-স্ত্রী 'একঘাট' করিতে হয় এ কথা আর কোন্ হিন্দুর সন্তান না জানে ? কাজেই তাপসীদের দিক হইতে আপত্তি তুলিবার আর পথ কোথায় ?

নিজের পিসি নয়—কান্তি মুখুজ্জের দূর সম্পর্কের ভাগিনেয়ী। তবু বুলুর

মা মারা যাওয়ার পর বুলুর ভার তিনিই লইয়াছিলেন এবং নিজের পিসির বাড়া হইয়াই চিরদিন এ সংসারে আছেন। কান্তি মুখুজ্জেও কন্যার আদরেই এতদিন আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে। কাজেই বাড়ীর ভিতরকার ব্যবস্থাপনা অথবা লোক-লৌকিকতার বিষয়ে উপদেশ পরামর্শের অধিকার তাঁহারই॥

বুলুকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তিনি ঈষৎ জোরের সঙ্গে বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন।

—শোন্ বাবা, এখন থেকে সবই যখন তোকে মাথায় নিতে হবে তখন কোনো কিছুই তো এড়িয়ে গেলে চলবে না, শুনতে হবে বুঝতে হবে। বৌমাকে না আনলে তো চলবেই না, আনতেই হবে যে।

কিন্তু নিজের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে যতই অবহিত হোক বুলু, তবু পিসিমার কথার না দিল উত্তর, না তুলিল মুখ। রাজলক্ষ্মী আর একবার বলেন—ওরা শুনছি কলকাতায় চলে গেছে। খুবই অভদ্রতা হয়েছে ওদের এটা, তবু আমাদের কর্তব্য আমাদের কাছে। আমি সরকার মশাইকে বলে সব ঠিক করিয়ে দিচ্ছি, কাল সকালের ট্রেনে তুমি চলে যাও সরকার মশাইয়ের সঙ্গে, বুঝলে? একটা দিন কলকাতার বাড়ীতে থেকে একেবারে পরশু বৌমাকে নিয়ে ফিরবে।

এতক্ষণে বুলু কথা বলে, বলে বেশ সজোরে মাথা নাড়িয়া—ও সব আমি পারবো না—চিনি না, কিচ্ছু না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—চিনতে তো হবে! নাকি হবে না? তোকে কিছুই বলতে কইতে হবে না বাপু, শুধু লোক-দেখ্তা একবার গিয়ে দাঁড়াবি, যা বলবার সবই সরকার মশাই বলবেন।

—সরকার মশাই নিজেই যান না তবে!

—না রে বাপু তা হয় না। এ সব সমাজ-সামাজিকতার ব্যাপার, যা নিয়ম তা করতেই হয়! তোমার দায় যখন—

—হ্যাঁ দায়! ভারি একেবারে ইয়ে—আমাকে কেউ চেনে বুঝি?

—নাঃ, এ ছেলেটা অচেনার ভয়েই সারা হলো দেখছি! ওরে বাপু এই সূত্রে চেনা-পরিচয় করে নেওয়াটাও তো হবে। হুট্ করে কাজটা হয়ে গেছে, মেয়ের মা-বাপ জানতে পারে নি, ব্যাপারটা তো একটু জগাখিচুড়ি মতনই হয়ে রয়েছে, পরিষ্কার করা দরকার নয় কি? অবিশ্যি নিন্দে আমি ওদের করবোই —যতই হোক মেয়ের পিতামহী যখন নিজে বসে সম্প্রদান করেছেন, তখন মা-বাপের আর বলবার কি আছে? তাছাড়া হিঁদুর মেয়ের বিয়ে, ফিরিয়ে দিতে

পারবি না তো? এদিকে এই এত বড় বিপদ ঘটে গেল, উদ্দিশ নেই, কিছু নেই, মেয়ে নিয়ে গট্ গট্ করে চলে গেলি! মেয়েই নয় তোদের মস্ত দামী বুঝলাম, কিন্তু আমাদের ছেলেই বুঝি ফেল্না?

বলা বাহুল্য রাজলক্ষ্মী দেবী যে উপযুক্ত শ্রোতা ভাবিয়াই বুলুকে এসব কথা শোনাইতে বসিয়াছেন তা নয়, বুলু উপলক্ষ্য মাত্র, নিজের মনের বিরক্তিটাই প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে থাকেন তিনি।

বকিতে বকিতে তিনি সরকার মশাইকে ডাকিতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেই বুলু মরীয়া হইয়া বলে—পিসিমা, ও সব কিছু করতে-টরতে হবে না সত্যিই নয় কিছু, শুধু শুধু—

পিসিমা সন্দিগ্ধভাবে বলেন—কি সত্যি নয়?

—ওই তো ওই সব—

সুকুমার লাবণ্যময় মুখ লজ্জায় লাল হইয়া ওঠে বুলুর।

তবু পিসিমা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অথবা না বোঝার ভান করেন হয়তো। বলেন—'কি সব'—তাই খুলে বল্ না বাপু? না বললে বুঝবো কি করে?

বুলু সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া ওঠে—নাঃ, তুমি কিছু বুঝতে পারো না সব বাজে কথা—বোঝো না বই কি!

—পারলাম না, রাজলক্ষ্মী হতাশ ভঙ্গীতে বলেন—না পারলে উপায় কি বল্? 'ওই সব' 'সেই সব' বোঝা আমার কর্ম্ম নয়।

—আঃ বাবারে! সেদিন যা সব কাণ্ড হলো মোটেই কিচ্ছু সত্য নয় দাদু শুধু শুধু কেন যে আমাকে—

সহসা দাদুর নাম মুখে আসিতেই অভিমানে বেদনায় নীল আকাশের মত উজ্জ্বল চোখ দুটি আসন্নবর্ষণ মেঘের ছায়ায় গভীর কালো হইয়া আসে এক ঝাপ্টা শীতল বাতাসের অপেক্ষা, ঝরিয়া পড়িতে বিলম্ব হইবে না।

'দাদু' 'দাদু'! যে নাম তাহার অস্থিতে মজ্জায় শিরায় শোণিতে একাকার হইয়া মিশিয়া আছে সে নামের অধিকারী যে আজ ত্রিভুবনের কোনখানে নাই একথা বিশ্বাস করা কি সহজ! বিশ্বাস করিবার মত করিয়া তলাইয়া ভাবিতে বসাও তো সম্ভব নয়। 'দাদু নাই' একথা মনে মনে উচ্চারণ করা মাত্রই যে মাথার মধ্যে কেমন একটা প্রবল আলোড়ন হয়, দুই চোখ ঝাপসা হইয়া আসে।

ছুটিয়া গিয়া ধরিয়া আনা যদি সম্ভব হইত!

শোক কি দুঃখ তা বুঝিতে পারে না বুলু, মনে হয় রাগ। হাঁ, রাগই হয় তাব দাদুর উপর। বুলুকে এমন ভাসাইয়া দিয়া দিব্য কোথায় গিয়া বসিয়া রহিলেন—বুলু এখন করে কি?

শুধু কি বিষয়-সম্পত্তি, কোলিয়ারির হিসাবপত্র, অথবা বুলুর নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা? আব একটা কি বিট্‌কেল কাণ্ডই না করিয়া গেলেন। সেটা যে ভালোমত করিয়া ভাবিতেও সাহস হয় না।

তবু যাই হোক ঘটনাকে "কিছু নয়—খেলা" গোছের ভাবিয়া লইয়া এই দিন পাঁচেকের মধ্যে ধাতস্থ হইতেছিল বেচারা, পিসিমা আবার নূতন করিয়া ফ্যাচাং তুলিলেন।

'বুলুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।'

কথাটা শুনিলে বন্ধুরা বলিবে কি?—কিন্তু বিবাহটাই কি সত্য? দাদুর মৃত্যুর মত এটাও যেন একটা নিতান্ত অবিশ্বাস্য ব্যাপাব, কিছুতেই মনকে মানাইয়া লওয়া যায় না।

অথচ একেবারে ভুলিয়া থাকাও কঠিন।

রাজলক্ষ্মীও বুলুর কথাটা শেষ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে চোখ মুছিয়া বলেন —সে কথা সত্যি, শেষটায় মামার যে কি জেদ হলো। জানি না ভালো করলেন না মন্দ করলেন। তারাই বা কি বকম মানুষ কে জানে—এই তো যা ব্যবহার দেখালে। তবুও ধর্ম্মসাক্ষী করে বিয়ে যখন হয়ে গেছে বাবা, 'সত্যি নয়' একথা তুই বলতে পারিস না। আর তাও বলি—এখনই হাসির কথা হয়েছে, নইলে এণ্ট্রেন্স পাস করে বিয়ে, আগের আমলে খুবই ছিল।·· তুই যা বাবা, অমত করলে হবে না। সরকার মশাইয়েব হাতে একটা চিঠি দিয়ে দিই আমি, পাঠিয়ে দেবার কথা জোর দিয়ে বলে দিই। বলতে গেলে আধখানা বিয়ে হয়ে রয়েছে, বৌভাত ফুলশয্যা পর্যন্ত হয় নি—শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গেলে 'ওটাও করে নিতে হবে যে!

—ধ্যেৎ! আমি ককৃখনো পারবো না।

বলিয়া উঠিয়া পালায় বুলু।

শেষ পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মী বেশ কিছু ভণিতা করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া সরকার মশায়ের হাতে পাঠাইয়া দেন এবং বৌ আসার আশা আর আশঙ্কায়

ঘণ্টা গুনিতে বসেন।

কিন্তু আশার জয় হইল না, হইল আশঙ্কার।

সরকার মশাই ফিরতি ট্রেনেই ফিরিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য একলা। আসিয়া নূতন কুটুম্ব সম্বন্ধে এমন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যেটা শ্রুতিমধুরও নয়, খুব বেশী সম্মানসূচকও নয়।

কেবলমাত্র আশাভঙ্গের মনস্তাপে নয়—অপমানের জ্বালায় রাজলক্ষ্মী যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা কটু দিব্যির সঙ্গে বলিয়া বসিলেন—থাকুক ওরা মেয়ে নিয়ে। দেখবো কান্তি মুখুজ্জের নাতির আর বৌ জুটবে কিনা, বুলুর আমি আবার বিয়ে দেবই দেব।

নিজের পড়ার ঘরে বসিয়া সব কিছুই শুনিল বুলু, কিন্তু তাহাকে আর কেহ কিছু জ্বালাতন করিল না। নিজে হইতে তার আর বলিবার কি আছে? শুধু একবার মনে করিতে চেষ্টা করিল—সরকার মশাইয়ের পিছু পিছু আর একটা মানুষ ঢুকিলে লাগিত কেমন!

মানুষ না ছবি?

দাদুর ঘরে একখানা বীণাবাদিনী সরস্বতীর ছবি আছে, ঠিক সেই ধরনের দেখিতে নয় কি? অবশ্য সেই অদ্ভুত রাত্রের কথা প্রায় কিছুই মনে পড়ে না, মনে করিতে গেলেই দিনের আলোয় দেখা একখানা ঝক্‌ঝকে জরিদার লাল শাড়ীমাত্র চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। ভাবিতে গেলে বল্লভজীর মন্দিরের ছায়াটাই শুধু চকিতের মত মনে পড়িয়া যায়।

খানিকটা আলো আর খানিকটা অলৌকিকত্ব।

তা ছাড়া আর কি?

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিয়া গেলে কলিকাতায় রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল বুলু, কিন্তু রাজলক্ষ্মী দেশের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইলেন না। কেন কি দরকার তাঁর কলিকাতায়? বুলু নাকি হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশোনার ব্যবস্থা করিতেছে—তবে? কিসের দায় রাজলক্ষ্মীর যে গোটাকতক ঝি-চাকর লইয়া সেই বৃহৎ বাড়ীখানা আগলাইয়া পড়িয়া থাকিবেন? কি ছাই আছে কলিকাতায়? এ তো তবু ভালো—কিছু না হোক 'বল্লভজী'র মন্দিরটায় দু'দণ্ড বসিলেও মনটা ভালো থাকিবে। রাণীগঞ্জে ফিরিবার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে।

মামার সেবার জন্যই কতকটা, তা ছাড়া কতকটা বুলুর জন্যও বটে, সর্ব্বত্রই মামার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াছেন, আজ সব দিক দিয়াই মুক্তি।

মাতৃহীন শিশু এখন তো স্বাবলম্বী বীরপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে—আর মামা নিজে তো দিব্যি নিজের পথ বাছিয়া সরিয়া পড়িলেন। অতএব রাজলক্ষ্মীরও এবার কর্ত্তব্য ফুরাইয়াছে।

তবে হ্যাঁ, স্বাভাবিক নিয়মে যদি সংসারটা চলিত সে আলাদা কথা। পড়ুক না বুলু হোস্টেলে থাকিয়া, পড়ার যদি অসুবিধাই হয় তাহাতে রাজলক্ষ্মী কি আর বাধা দিবেন? এমন অবুঝ নন তিনি। ছেলে মূর্খ হইয়া কোলজোড়া করিয়া থাকুক এ সাধ তাঁহার নাই, কিন্তু বৌটিকে কাছে আনিয়া রাখিবার সাধ কি খুব বেশী অসঙ্গত?

কত আদরে স্নেহে মমতায় সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেন তাহাকে। তারপর যার সংসার তার হাতে তুলিয়া দিয়া ছুটি লইতেন। বুলুর মার পরিত্যক্ত গৃহস্থালি কুড়াইয়া লইয়া কিসের আশায় আগলাইয়া বসিয়া আছেন এতদিন? বুলুর বৌয়ের হাতেই তুলিয়া দিবার সুদূর আশা লইয়া নয় কি?

বৌটি এখানে থাক্—ছুটিছাটা পাইলেই বুলু এক-আধবার বাড়ী আসুক। হইলই বা ছেলেমানুষ, কিন্তু সত্যকার ভালোবাসিবার—বন্ধুত্ব করিবার—নিবিড় সখ্যতায় অন্তরঙ্গ হইবার বয়স তো এই। নব পরিণয়ের মাধুর্য্য উপভোগ করিবার অবকাশ তো এখনই—লজ্জা সঙ্কোচ কুণ্ঠার আড়ালে।

বঞ্চিত নারীহৃদয়ের ঔৎসুক্য লইয়া—কল্পনায় অনেক মধুময় ছবি আঁকিতে বসেন রাজলক্ষ্মী এই কিশোর দম্পতিকে কেন্দ্র করিয়া, কিন্তু ছবি সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার ভাগ্য রাজলক্ষ্মীর নয়। বারে বারে তাই উজ্জ্বল রঙের তুলি বিবর্ণ হইয়া আসে। আর তাপসীর উপর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিতে থাকে।

অবশ্য তাপসীর আর দোষ কি, দোষ তার বাপ-মার।

ভারি পয়সা মণীন্দ্র বাঁড়ুয্যের, তাই ধরাকে সরা দেখিতেছে! মুখে উচ্চারণ করিলে শুনিতে খারাপ, তা নয়তো বুলুর পয়সায় বুলু অমন দশটা মণি বাঁড়ুয্যেকে চাকর রাখিতে পারে। ছেলের শীঘ্রই আবার বিবাহ দিবার সংকল্পটা এ রকম সময় খুব প্রবল হইয়া ওঠে, কিন্তু তাপসীর মুখখানি মনে পড়িলেই যেন সংকল্প শিথিল হইয়া যায়।

সেকালের রাজপুত্রেরা যেমন বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিত—

তাপসীকে তেমনি উদ্ধার করিয়া আনা যদি সম্ভব হইত বুলুর পক্ষে!

যাক্, মনে মনে মানুষ কত কিই ভাবে, বাস্তব-ক্ষেত্রে তো দাম নাই সে সব কথার। যে কথার দাম আছে সেই কথাই কহিতে হয়।

বুলুর কলিকাতা যাইবার মুখে তাই রাজলক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দেন—দেখো বাপু, একটি কথা বলে রাখছি—কোনো ছলে কোনো উপলক্ষ্যে ওদের বাড়ীর ছায়াটি মাড়াবে না।

অন্যমনা বুলু ফস্ করিয়া প্রশ্ন করে, কাদের বাড়ী পিসিমা?

কাদের আবার, তোর ওই গুণধর শ্বশুর মশাইয়ের! এখন তো অগ্রাহ্য করে মেয়ে নিয়ে চলে গেলো, যেন কোনো সম্বন্ধই নেই। শেষে পস্তাতে হবে! তখন যে টুপ্ করে ওখান থেকে যাওয়া-আসা করিয়ে জামাইটিকে বশ করে নেবেন তা হতে দিচ্ছি না।

—ধ্যেৎ! পিসিমার যত্তো সব ইয়ে! বশ আবার কি? যাচ্ছে কে?

রাজলক্ষ্মী মুচকি হাসিয়া বলেন—তা কি জানি, টুকটুকে বৌ হয়েছে, তোর যদি শ্বশুরবাড়ী যাবার মন হয়, তাই সাবধান করে দিচ্ছি। তোর পড়াশুনো শেষ হওয়াটা পর্য্যন্ত দেখবো, খোশামোদ করে মেয়ে পৌঁছে দেয় তো ভালো কথা—নচেৎ আবার তোর বিয়ে দেব আমি। কি বলবো—মামা নেই তাই, নইলে এখুনি ওদের নাকের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বৌ ঘরে তুলতাম। ওরু মেম-ফ্যাশানী মা মেয়ে নিয়ে বসে বসে দেখতো। মামা অসময়ে চলে গিয়ে—

রাজলক্ষ্মী আর একবার চোখ মুছিবার জন্যে কথা থামাইতেই বুলু তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম ঠুকিয়া—'দেরি হয়ে যাচ্ছে পিসিমা'—বলিয়া ব্যস্ত হইয়া ওঠে। ওসব কথার আলোচনা তাহার পক্ষে অস্বস্তিকর।

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর যেন আর অন্য চিন্তা নাই, অন্য কথা নাই।

নিজে ভুলিতে পারেন না বলিয়াই বোধ করি অপর কাহাকেও ভুলিতে দেন না। অথচ ভুলিয়া যাওয়াই সব চাইতে ভালো ছিল না কি!

ট্রেন ছুটিতে থাকে। বুলুকে ঘুমাইবার পরামর্শ দিয়া, সরকার মশাই নিজে নাক ডাকাইতে শুরু করেন—আর খোলা জানলার বাহিরে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া বিনিদ্র বুলু বসিয়া থাকে। বসিয়া বসিয়া কি ভাবে কে জানে!

কৈশোর কাল—স্বপ্ন দেখিবার কাল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন,

নিজেকে রচনা করিবার দুরন্ত ইচ্ছার উদ্দাম স্বপ্ন—আবহমান কাল হইতে পৃথিবীর সমস্ত কিশোরচিত্ত যে বেদনাময় আনন্দের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে তাহার স্বপ্ন।

আসিবার সময় পিসিমা এমন একটা কথা বলিয়া বসিলেন—অদ্ভুত! এদিকে নিজেই তো 'ধর্ম্মসাক্ষীটাক্ষী' কত কি বলিলেন! 'ফেরত দিবার উপায় নাই' 'বদলাইবার উপায় নাই' কত সব কথা! এখন আবার উল্টোপাল্টা কথা শুরু করিয়াছেন!

ধ্যেৎ! দাদু মা করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহার উপর বুঝি সর্দ্দারি ফলাইতে আছে!—আর এত ভাবনারই বা কি দরকার? বুলুর বুঝি লেখাপড়া নাই? কলিকাতার পড়া সাঙ্গ করিয়া বুলু বিলাত যাইবে না যেন!

কলিকাতায় আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল বটে, কিন্তু প্রথমটা কিছুতেই মন বসাইতে পারিত না বুলু। তাহার সদ্য শোকাহত উদ্‌ভ্রান্ত মনের অবস্থায় সহপাঠীদের হৈ-হল্লোড়, অকারণ হাসি, অর্থহীন গল্প নিতান্ত বাজে আর বিশ্রী লাগিত। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার মত সপ্রতিভ নয় যে, কাজেই মন-মরাভাবে আপনার লেখাপড়া লইয়া একপাশে কাটাইয়া দিত।

কিন্তু বয়সটা ষোলো আর জায়গাটা ছাত্রাবাস।

নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া একপাশে পড়িয়া থাকা বেশীদিন সম্ভব নয়। প্রবল বন্যার আকর্ষণে কে কতদিন অটল থাকিতে পারে? আসন্ন যৌবনের সোনার কাঠি ঘুমন্ত মনকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া তোলে, চিত্ত শতদলের এক-একটি দল বিকশিত হইতে থাকে, উন্মুখ হৃদয় বিরাট বিশ্বকে আপনার ভিতর গ্রহণ করিতে চায়।

সকলকে ভালোবাসিতে ইচ্ছা হয়, সকলকে আপনার মনে হয়—অকপট সরলতায় ধীরে ধীরে ধরা দেয় বুলু।

দলের মধ্যে সুকুমার নামক ছেলেটিই চাঁই। সদা-হাস্যময় কৌতুকপ্রিয় এই ছেলেটিকে প্রত্যেকেই ভালোবাসে, বলিতে গেলে বুলু তো তার প্রেমমুগ্ধ ভক্ত। কিন্তু সুকুমারই একদিন তাহার মাথা খাইয়া বসিল।

বুলু তখন ঘরে অনুপস্থিত, কি একটুকরা কাগজ লইয়া হাসির বান ডাকিয়াছে ঘরে।

উপলক্ষ্যটা যে বুলু সেটা একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়।

বেশ কিছুক্ষণ হুল্লোড়ের পর রঙ্গমঞ্চে বুলুর আবির্ভাব ঘটে। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা প্রচণ্ড হাসির রোল। বুলুও হাসিমুখে প্রশ্ন করে—কি হলো হঠাৎ?

—আর কি হলো! রমেন চশমার ভিতর হইতে চোখ পাকাইয়া বলে—কি বাবা ভালো ছেলে, ডুবে ডুবে জল খেতে শিখেছো! উঃ, আমরা ভাবি কি ইনোসেণ্ট!

—তা হঠাৎ এমন কি প্রমাণ পেলে আমার বিরুদ্ধে? বুলু প্রশ্ন করে।

সুকুমার বাঁকা হাসির সঙ্গে বলে, আমরা কি জানতে পারি 'তাপসী' নাম্নী ভদ্রমহিলাটি কে?

—তাপসী?

আর কিছুই বলে না বুলু, কিন্তু চম্‌কানিটা সুস্পষ্ট।

নিত্য নূতন ফন্দী আঁটিয়া আশেপাশে সকলকে ক্ষেপানো সুকুমারের একটা বিশেষ শখ। সহপাঠীদের তো বটেই, প্রফেসারদেরও ছাড়িয়া কথা কহে না সে। মাঝে মাঝে তাদের নাকালের এক শেষ করিয়া ছাড়ে। সুকুমার যখন বুলুর খাটের তলা হইতে একখানা লেটার প্যাডের পাতা কুড়াইয়া আনিয়া এত হাসাহাসি জুড়িয়া দিয়াছিল, রমেন দিলীপ পরেশ শিবনাথ প্রভৃতি সকলেই ভাবিয়াছিল এটা সুকুমারের নূতন কীর্তি। পরের হাতের লেখা নকল করিবার একটা বিশেষ ক্ষমতা সুকুমারের আছে কিনা!

কাগজখানার একটা পিঠ ভর্তি শুধু একই নাম লেখা—ইংরাজী, বাংলা, টানাহাতের মুক্তাক্ষর। আবার সবগুলির উপর হিজিবিজি আর বড় বড় করিয়া লেখা একটি নাম—তাপসী—তাপসী—তাপসী!

কিন্তু বুলুর চম্‌কানিটা যে নিতান্তই সন্দেহজনক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাপসী, যাঁর নামের জপমালা তৈরী হয়েছে। চিনতে পারেন হাতের লেখাটা? রমেন সোৎসাহে প্রশ্ন করে।

চিনিতে দেরি হয় না। একটা ফাউণ্টেন পেন কিনিয়া আনিয়া নিবটার গুণাগুণ পরীক্ষার্থে বার বার এই নামটাই লিখিয়াছিল বুলু লেটার প্যাডের পাতা ভর্তি করিয়া—কাল কি পরশু ঠিক স্মরণ নাই!

বুলুর অবশ্য আগের চাইতে উন্নতি হইয়াছে, তাই ধাতস্থ হইতে দেরি লাগে না। লজ্জায় লাল হইয়া পড়িয়া অপ্রতিভও হয় না। কাগজখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই অবহেলাভরে বলিয়া উঠে—ওঃ, এই। আমি ভাবলাম না

জানি আমার বিরুদ্ধে কি ভয়ানক সব প্রমাণপত্র যোগাড় করেছিস্। নতুন পেনটার নিবটা পরীক্ষা করতে যাজেবাজে একটা নাম লিখছিলাম বটে কাল!

সুকুমার সন্দিগ্ধভাবে বলে—বলি হে বাপু, এত নাম থাকতে হঠাৎ এই নামটিই বা নির্ব্বাচিত হলো কেন?

—যা হোক কিছু—যে কোনো একটা নাম লিখলেই তোমরা তা থেকে সূত্র আবিষ্কার করতে বসতে, ওর আর কি! ধরো যদি—ওর বদলে 'ক্যাস্তকালী' লিখতাম।

—তাই ব লিখবে কেন? পরেশ গম্ভীরভাবে বলে--আমাদের আদরের প্রাণকেষ্টর নাম লিখতে পারতে।

প্রাণকেষ্ট হোস্টেলের চাকর।

পরেশের কথায় সকলেই আর একদফা হাসিয়া ওঠে।

--প্রফেসর দিগ্বিজয় রায়ের নামটাই বা লিখতে বাধা কি ছিল? ওঁকে যখন অত পছন্দ করি আমরা।

বুলু হাসিয়া প্রশ্ন করে।

বলা বাহুল্য উক্ত ভদ্রলোকটি ছাত্রমহলের দু'চক্ষের বিষ।

—ওই দেখ, সুকুমার তীক্ষ্মস্বরে বলে—নিজের কথাতেই ধরা পড়ে যাচ্ছে ছোক্‌রা। দিগ্বিজয়কে আমরা পছন্দ করি না বলেই ঠাট্টা করতে ওর নামটাই মনে পড়লো বুলুর। তার মানে—ঠাট্টাটা বাদ দিলে এই দাঁড়ায়, যাকে পছন্দ করি খাতার পাতায় তার নাম লিখি।

—চমৎকার। তুই আবার বলিস্ কিনা তুই অঙ্কে কাঁচা! বলিয়া গায়ের শার্টটা খুলিতে খুলিতে নিজের ঘরে চলিয়া যায় বুলু। কিন্তু এ ঘরে আর তাড়াতাড়ি আসে না, চুপচাপ বিছানায় বসিয়া থাকে।

কি আশ্চর্য্য! এত নাম থাকিতে ও নামটাই বা লিখতে গেল কেন সে? নিজের অজ্ঞাতসারেই লিখিয়াছিল কি? স্পষ্ট মনে পড়ে না, খেয়ালের মাথায় একবার লিখিয়া ফেলিয়া বার বার সেইটাই চালাইয়া গিয়াছে মাত্র।—ধ্যেৎ! কি মনে করিল ওরা কে জানে! সত্যই কিছু সন্দেহ করিবে না তো? কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেই ভালো ছিল।

কয়েকটা দিন কাটিয়াছে। সেদিনের কথা বুলুর তো মনে নাই বটেই আর

কেহ যে মনে রাখিবে এমন সন্দেহ করিবার হেতু নাই। হঠাৎ সুকুমার একদিন কোথা হইতে যে কি পাকা দলিল যোগাড় করিয়া বসিল কে জানে—বুলু দেখিয়া অবাক হয়, তাহার দিকে যে তাকায় সে-ই হাসিতে শুরু করে।

ব্যাপার কি? বুলু কি রাতারাতি চিড়িয়াখানার নূতন আমদানি চীজ বনিয়া গেল নাকি? যত দূর মনে পড়ে সেদিনের মত বেফাঁস বোকামি তো আর একবারও করিয়া বসে নাই।

তবে?

সংক্রামক ব্যাধির মত এ হাসি যে ক্রমশই ছড়াইয়া পড়িতেছে।

নাঃ, আজ আর নিজে যাচিয়া ব্যাপার জানিতে যাইবে না বুলু। তাহার যেন আর মানমর্যাদা নাই! মনে মনে মনে হঠাৎ ভারি একটা অভিমান হয়, বিশেষ তো সুকুমারের উপর। এত ভালোবাসে বুলু সুকুমারকে, অথচ সুকুমারই তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য নিত্য নূতন ফন্দী আবিষ্কার করিয়া বেড়ায়!

স্বভাবদোষে সুকুমার সকলকেই ক্ষেপাইয়া মারে বটে, কিন্তু আজকে বুলুর প্রতি আক্রমণটা যেন বড় প্রবল। কেন? ক্লাসসুদ্ধ ছেলেকে বলিয়া বেড়াইবার মত কি এমন অপকর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছে বেচারা?

যাক্‌গে, কারণ জানিবার প্রয়োজন নাই।

নিজের ঘরে আসিয়া সকালের পড়া খবরের কাগজখানা মুখের সামনে ধরিয়া মনে মনে রাগে ফুলিতে থাকে বুলু।

কিন্তু বুলুকে আজ আর ওরা স্বস্তিতে থাকিতে দিবে না। মিনিট কয়েক পরেই সদলবলে সুকুমারের আবির্ভাব। একটানে কাগজখানা টানিয়া লইয়া হৈ হৈ করিয়া ওঠে—কি বাবা যুধিষ্ঠির, কি হলো? এত বড় কাণ্ডটা বেমালুম চেপে যাচ্ছিলে? এখন যে হাটে হাঁড়ি ভাঙলো তার কি! দুধে-দাঁত না ভাঙতেই বিবাহ-পর্ব্বটা সেরে বসে আছো বাবা!

উঃ! ধৈর্য্যের বাঁধ আর কতক্ষণ থাকে মানুষের? এত বড় আঘাতেও ভাঙিয়া পড়িবে না? ক্ষোভে অপমানে স্বর্গত দাদুর উপর দুরন্ত অভিমানে আপাদমস্তক আলোড়িত হইয়া এক ঝলক জল আসিয়া পড়ে চোখে।

হায়! এটা বাড়ী নয়, কিংবা পিসিমার স্নেহচ্ছায়া নয় যে চোখের জলের মূল্য থাকিবে। ফল ফলিল বিপরীত। একবাক্যে সকলে স্থির করিল বৌয়ের জন্য মন কেমন করিতেছে বুলুর।

বলা বাহুল্য কোথা হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সহপাঠীমহলে

রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে স্থকুমার—বুলু বিবাহিত।

অতঃপর অনেক প্রশ্ন বর্ষণ হইতে থাকে বুলুর উপর।

বুলুরা সত্যই বাঙালী অথবা খোট্টা? বিবাহ কি তাহার দুগ্ধপোষ্য অবস্থাতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল? এ হেন শুভকর্ম্মটি একেবারে সারিয়া লইয়া কলেজে ঢোকার কারণ কি বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণে ফাঁকি দেওয়া? বৌ দেখিতে কেমন? বন্ধুদেব একদিন দেখাইবে কি না বুলু? এই সব অজস্র প্রশ্ন।

প্রশ্ন এবং পরিহাসের ভঙ্গীতে অবশ্য 'দুগ্ধপোষ্যতা'র আভাস খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হয়। সহপাঠীদের মধ্যে দু-চার বছরের বড ছেলেব তো অভাব নাই।

বুলু কোন উত্তরই দেয় না, আর কাঁদিয়াও ফেলে না! ভারী মুখে চুপচাপ বসিয়া থাকে। বন্ধুদের উপর রাগ করিতেও যেন পথ থাকে না। সত্যই তো সে একটা খাপছাড়া—স্বষ্টিছাডা অভিশপ্ত জীব। জীবনের প্রারম্ভে যে অভিশাপ বর্ষণ করা হইয়াছে তাহার উপর, তাহার ফল ভুগিতে হইবে না? এই সভ্য-জগতে সভ্যসমাজে এমন অসভ্য ব্যাপার কি কাহারও জীবনে ঘটে?

বন্ধুদের উপর অভিমানে কিছুদিন আর ভালো ভাবে মেলামেশা করে না বুলু, আপনমনে নিজের পড়াশোনা লইয়াই থাকে। নিজেকে যেন সকলের চাইতে স্বতন্ত্র মনে হয়। ভালোও লাগে না। এই ছোট গণ্ডির মধ্যে সামান্য কয়খানা পাঠ্য-পুস্তক নাডাচাড়া করিয়া দিন কাটানো, আর পরীক্ষার শেষে গোটাকয়েক নম্বর বেশী পাওয়ার মধ্যেই কি জীবনের সার্থকতা?

দূর-দূরান্তরের দেশ হইতে কে হেন হাতছানি দিয়া ডাকে—কোথায় সেই অগাধ সমুদ্র, তুষারকিরীট পর্ব্বতমালা, বিচিত্র-ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্মভূমি—সভ্যতা আর সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন—বিশাল পৃথিবী—বিরাট জগৎ—এতটুকু একটা ঘরের মধ্যে নিজেকে আটকাইয়া রাখিবার জন্যই কি মানুষের স্বষ্টি?

কিন্তু অপেক্ষা করিতে হইবে, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই, বিশ্বের দরবারে যে এখনও নিতান্তই নাবালক সে।

ধীরে ধীরে আবার কিছুটা সহজ হইয়া আসে, আবার সহপাঠীদের আক্রমণের ফাঁদে ধরা দিতে হয়। সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, পিকেটিং, কর্ত্তৃপক্ষের অনুশাসনের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট—ছাত্রজীবনের বহুবিধ উত্তেজনার মধ্যে কাটিতে থাকে দিনগুলি। অতীতের দুঃস্বপ্ন আর তেমন অব্যবস্থিত করিয়া তুলিতে পারে না। ভীতিবিহ্বল কিশোর চিত্তে আসে যৌবনের দৃঢ়তা, অগাধ সমুদ্রের রহস্যময়

আহ্বানে সাড়া দিবার সাহস খুঁজিয়া পায়, নূতন নূতন জ্ঞান আহরণের সংকল্পে সেই সমুদ্র পাড়ি দেয় বুলু।

অবলম্বনহীন রাজলক্ষ্মী রোষে ক্ষোভে স্বর্গগত মাতুল হইতে শুরু করিয়া বুলুর অর্দ্ধবিবাহিতা বধূ পর্য্যন্ত সকলকে গালি দেন, নিত্য দুইবেলা কাশীবাসের সংকল্প ঘোষণা করেন আর বাঘিনীর মত আগলাইয়া থাকেন বুলুর ঘর-বাড়ী বিষয়-সম্পত্তি। সাতসমুদ্র পার হইয়া বুলু যেদিন ঘরে ফিরিবে, সেইদিন তাহাকে সব কিছু বুঝাইয়া পড়াইয়া তবে তাঁহার ছুটি।

ইত্যবসরে বার দুই সরকার মহাশয়কে লুকাইয়া মূল্যবান উপহারসহ বুলুর শ্বশুরবাড়ী লোক পাঠাইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য ফলাফলটা সুবিধাজনক হয় নাই!

চিত্রলেখা তাহাদের তো উপহার-দ্রব্যসমেত পত্রপাঠ বিদায় করিয়াছে বটেই, কিন্তু না করিলেও যে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ শোভনীয় ব্যাপার ঘটিত এমন নয়। অসম্ভব কল্পনা হইলেও চিত্রলেখা যদি রাজলক্ষ্মীর স্নেহ-ক্ষুধার তৃপ্তি সাধনার্থে মেয়েকে পাঠাইতেই রাজী হইত, সালোয়ার-পাঞ্জাবি-পরা সাইঁকেল-চাপা বোকে লইয়া রাজলক্ষ্মী তৃপ্ত হইতে পারিতেন কি?

আসল কথা, মিলের যেখানে একান্তই অভাব, সেখানে মিশ খাওয়াইবার চেষ্টাই প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। বিপজ্জনকও বটে।

তাই না শূন্যমণ্ডলবাহী লক্ষ লক্ষ গ্রহ কেহ কাহারও নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না, সুদূর ব্যবধানে আপন আপন কেন্দ্রে পাক খাইয়া মরে!

চিত্রলেখা আর রাজলক্ষ্মী ভিন্ন গ্রহবাসী, ভুলক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি আসিবার চেষ্টা করিতে গেলে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন মধুর পরিণতির সম্ভাবনা কোথায়?

কে জানে সাত সমুদ্র পার হইতে বুলু কোন্ ভিন্নমূর্ত্তি লইয়া ফিরিবে? রাজলক্ষ্মীকে চিনিতে পারিবে তো?

ঢিলে পায়জামা আর হাফ্‌শার্ট পরা তাপসীকে রাখিয়া দীর্ঘদিনের জন্ত বিদায় লইয়াছিলাম, যবনিকা উত্তোলন করিতেই দেখা গেল—আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাপসীর।

কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তাই যে তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন ছাঁদে গড়িয়া রূপের উপর অপরূপত্ব দান করিয়াছেন তাহা নয়, প্রয়োগ-নৈপুণ্যের নিখুঁত কৌশলে সৃষ্টিকর্ত্তার উপরও টেক্কা দিতে শিখিয়াছে সে। বাস্তবিক রূপচর্য্যাকে যদি শিল্পকলা হিসাবে ধরা যায় তো তাপসীকে ভালো শিল্পী বলা উচিত। সাজসজ্জায় অতিমাত্রায় আধুনিক হওয়াটাই যে সৌন্দর্য্যের মাপকাটি এ বিশ্বাস তাহার নাই, তাই ফ্যাশন-শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া নিজেকে ইচ্ছা-মত ফুটাইয়া তুলিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করে না সে।

মেয়ের সঙ্গে তাই আর কোনকালেই বনিল না চিত্রলেখার।

নিজের তো সব পথ বন্ধ—বৈধব্যের বেশের উপর কতটাই আর পালিশ লাগানো যায়? অতএব মেয়ের উপর দিয়া মনের সাধ মিটানোর ইচ্ছাটা কি খুব বেশী অন্যায় চিত্রলেখার? কিন্তু মেয়ে যেন বুনো ঘোড়া। তা নয়তো দেশী বিলাতী সকল দোকান ঘুরিয়া চিত্রলেখা নিজে যে শাড়ী ব্লাউজ জুতা ম্যাচ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছে, মানাননই সেই জুতাটাকে বাতিল করিয়া দিয়া একটা জরির চটি পরিয়া বেড়াইতেছে মেয়ে! তার উপর আবার কপালের উপর পিতামহীর আমলের একটা মুক্তার সিঁথি!

দেখিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় কিনা!

বাছিয়া বাছিয়া আবার কেমন দিনটিতে এহেন কিম্ভূত সাজ করা!

কিনা যেদিন কিরীটীর আসিবার কথা।

কত চেষ্টায় চিত্রলেখা এই ছেলেটিকে যোগাড় করিয়া আনিয়া মেয়ের চোখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে—আর মেয়ের মোটে গ্রাহ্যই নাই! অথচ এমন একটি পাত্র গাঁথিয়া তুলিতে পারিলে যে কোনো মেয়ে ধন্য হইয়া যায়।

শুধুই কি বিদ্যায়? বুদ্ধিতে, সৌজন্যে, অর্থে, স্বাস্থ্যে অতুলনীয় বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। তার উপর রূপ—যেটা পুরুষের পক্ষে বাড়তি বলিলেও চলে। সে হিসাবে সৃষ্টিকর্ত্তার একটি বেহিসাবী অপচয়ের নমুনা কিরীটী।

এত রূপ, এত গুণ, এত টাকা কিরীটীর, তবু মেয়ের অন্ত পাওয়া ভার। কখনো মনে হয় বেশ সুগাহা—কিরীটীর আসার কথা থাকিলে মেয়ের যে উন্মুখ চাঞ্চল্য সে তো আর চিনতে ভুল হয় না চিত্রলেখার, কিন্তু পরদিনই আবার সব গোলমাল হইয়া যায়, নিজের হিসাবের উপর আর আস্থা থাকে না। হতাশ চিত্রলেখা হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের মরণ কামনা করিতে বসে।

এই তো সেদিন কিরীটী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র, আর নাকের উপর

দিয়া গট্‌গট্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল বেবি! ভদ্রতা রক্ষা হইল কি ভাবে! না—"এই যে মিস্টার ভালো তো? বসুন, মা আছেন।" ব্যস্‌। যেন তোর মার চরণ-দর্শন-পিপাসাতেই এক গ্যালন পেট্রল পুড়াইয়া তোদের দরজায় আসিয়াছেন মিস্টার মুখার্জ্জি! মূর্খ! মূর্খ! তাছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন নির্ব্বোধের বংশ! শেষ পর্য্যন্ত স্বর্গবাসী স্বামী, আর কাশীবাসিনী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর উপরেই সমস্ত ক্রোধটা গিয়া পড়ে।

আজও যে মেয়ের এই সৃষ্টিছাড়া সাজ, এ আর কিছুই নয়—কিরীটীর উপর অবহেলা দেখানো আর মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ-ঘোষণা। ওই যে সকালবেলা ফোন করিয়া জানাইয়া রাখিয়াছে কিরীটী যে সন্ধ্যার 'শো'র জন্য চারখানা টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছে লাইট-হাউসের! তাই আগে হইতেই বিদ্রোহের সাজ! কত বুদ্ধিমান আর অমায়িক ছেলে! বেবিকে একলা লইয়া গেলেই কি আপত্তি করিত চিত্রলেখা? তা তো নয়। তবু সব সময় অমিতাভ, সিদ্ধার্থ সকলকে সঙ্গে নেয়। অথচ বাঙালীর ঘরের কূপমণ্ডূপক ছেলেও নয়—ইয়োরোপ আমেরিকা জাপান সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আসিয়াছে।

শিক্ষা সহবৎ বুদ্ধি বিবেচনায় অনিন্দ্য। হাজারেও একটা অমন ছেলে মেলে না। কিন্তু হতভাগা মেয়ে কিছুরই মর্য্যাদা দেয় না।

'বলিব না' প্রতিজ্ঞা করিয়াও শেষ অবধি থাকিতে পারে না চিত্রলেখা। মেয়েকে ডাকিয়া প্রশ্ন করে—এটা কি হয়েছে বেবি?

—কোন্‌টা মা? সরল সুরে প্রতিপ্রশ্ন করে তাপসী।

—এইটা! তোমার এই বিদঘুটে সাজটা! আবার তুমি ওই বিশ্রী গয়নাটা কপালের ওপর চড়িয়েছো? সিনেমা যাবার কথা রয়েছে না আজ?

—সিনেমা? কই?

—ন্যাকামি করিস্‌নে বেবি, সকালবেলা ফোন করলো না কিরীটী?

—ও হো হো। ভুলেই গেছলাম। যাক্‌গে গেলেই হবে, কিন্তু সিঁথি পরলে ঢুকতে দেবে না, না কি বলছো?

—বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। ওই জঘন্য সাজটা সেজে যেতে লজ্জা করবে না তোর?

—কেন লজ্জা করবে? বাঃ, নানির এই সিঁথিটার দাম এখন কত জানো?

—জানি না, জানতে চাইও না। দামী হলেই সেটা বাহার হয় না সব সময়। তাহলে ওই 'গিনি'র মালাটাই বা গলায় ঝুলিয়ে বেড়াও না কেন?

ওরও তো অনেক দাম।

—ওটা আমার ভালো লাগে না তাই। ওর তো কোনো সৌন্দর্য্য নেই।

—আর এইটায় খুব আছে কেমন? আচ্ছা যতই সৌন্দর্য্য থাক্, ওটা খুলে ফেল আজ, আর ওই জরির চটি।

—পাগল হয়েছো মা। কি একটু সিনেমা যাবো তার জন্যে আবা' নতুন করে এত কাণ্ড। যা আছি বেশ আছি।

—আচ্ছা বেবি, তুই কি আমায় পাগল কর'বি? এ রকম সেকেলেপনা দেখলে কিরীটী কি মনে করবে বল্ তো?

—পাগল তোমায় নতুন করে ক'তে হবে না ম, নিজেই তুমি যথেষ্ট পাগল আছো। জগতে এত লোক থাকতে মিস্টার মুখার্জ্জি কি মনে করবেন ভেবে এত দুশ্চিন্তা কেন?

চিত্রলেখা মেয়ের ইচ্ছাকৃত ন্যাকামি আর বরদাস্ত করতে পারে না, জলিয়া উঠিয়া বলে—দুশ্চিন্তা কেন তা তুমি বোঝ না? তুমি কি মনে করো তুমি ভিন্ন আর পাত্রী জুটবে না ওর? নেহাৎ নাকি অতি অমায়িক, অ ত ভদ্র ছেলে, তাই এখনো পর্য্যন্ত তোমার খামখেয়ালীপনা সহ্য করছে। একবার যদি মন ঘুরে যায়—

তাপসী এইবার কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া পড়ে। ধীরস্বরে বলে—কার কখন মন ঘুরে যাবে সেই ভয়ে কাতর হওয়া আমার পোষায় না মা। বাংলা দেশে পাত্রীর অভাব নেই, ওর যে একটাও জুটবে না এমন বাজে কথা ভাবতেই বা যাবো কেন? কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? শুধু শুধু খানিকটা ভুল ধারণা নিয়ে থেকো না।

ভুল ধারণা!

চিত্রলেখা করিবে ভুল ধারণা? মেয়েকে বরং সে বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু কিরীটীর বিষয়ে ভুল করিবার কিছু নাই। কাছাকাছি আসিলেই তাহার চোখে মুখে যে আলো জলিয়া ওঠে সে আলো চিনিতে কি ভুল হয়?

সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কত নীলনয়না রূপসীর, বিদ্যাবতী তরুণীর মোহ এড়াইয়া সে যে চিত্রলেখার মেয়েদের হৃদয়দ্বারে প্রার্থী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এটাই কি সোজা বিস্ময়? হউক না তাহার সুন্দর মেয়ে, তবু বিদেশিনীদের রূপগুণ হাস্যলাস্য আকর্ষণী শক্তির কাছে কি? তাহাদের তুলনায়

সত্যই কিছু আর চোখে পড়িবার মত নয় তাপসী। তবু কিরীটী যে বেবির প্রেমে পড়িয়াছে একথা চন্দ্র সূর্য্যের মতই সত্য। চিত্রলেখার ধারণা ভুল নয়।

হঠাৎ একটা কথা মনে হয়—তাপসীর এই যে অবহেলার ভাব, বোধ করি বা অভিমান, হয়তো কিরীটীর প্রেমে আজও সন্দেহ আছে তার, তাই মাঝে মাঝে নিজেকে সরাইয়া লয়। তাই মাকে বলিল, 'মিথ্যে খানিকটা ভুল ধারণা নিয়ে থেকো না।' অর্থাৎ 'মিথ্যা আশা মনে পোষণ করিও না।'

মেয়ের খামখেয়ালী ব্যবহারের খানিকটা হদিস আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া চিত্রলেখা বেশ খানিকটা ধাতস্থ হয়। প্রসন্ন কণ্ঠে বলে—ভুল ধারণা কিছুই নয় রে বাপু, কিরীটীর মন জানতে আর বাকী নেই আমার, এখন শুধু অপেক্ষায় আছে বোধ হয়—'দেখি এদিক থেকে কোনো প্রস্তাব ওঠে কিনা।' তা এইবার আমি—

প্রস্তাব তো চিত্রলেখা কবেই করিত, কেবলমাত্র 'মনমর্জ্জি' মেয়ের ভয়েই সাহস করে না। যা থাকে কপালে, এইবার একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ছাড়িবে সে নির্ঘাত।

তাপসী আরো বেশী গম্ভীরমুখে বলে—দেখ মা, তোমায় বাপু বারণ করে দিচ্ছি, ওসব যা তা করতে যেও না। মানুষ কি পুতুল—যে একটাকে নিয়েই বার বার খেলা যায়?

—কি হলো কথাটা? চিত্রলেখা তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে—তোমার এ কথার অর্থ?

—অর্থ-টর্থ জানিনে মা, শুধু তোমায় বলে রাখছি, আমার ওপর থেকে আশা ছাড়ো। আজ মিস্টার মুখার্জ্জি পছন্দ করবেন না বলে আমি শাড়ী ছেড়ে স্কার্ট ধরবো—অথবা কাল মিস্টার লাহিড়ী পছন্দ করছেন না ভেবে চা ছেড়ে কোকো ধরবো—এসব আমাকে দিয়ে হবে না।

দুই চোখে অগ্নিবাণ হানিয়া চিত্রলেখা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকার পর ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—তোমার মতলবটা আমাকে খুলে বলবে?

—আমার আবার মতলব কিসের? যেমন আছি তেমনি থাকব—ব্যস।

—ব্যস? এ কি ছেলেখেলা পেয়েছো নাকি?

—অকারণ রাগ করছ কেন মা? নানির দেওয়া গয়নাগুলো আমার পরতে ভালো লাগে তাই পরি, তোমার যদি খুব বিরক্তিকর লাগে, আর পরবো না। কপাল হইতে সিঁথিটা খুলিয়া ফেলিতে উদ্যত হয় বেবি।

চিত্রলেখা বোধ করি কিছুটা অপ্রতিভ হয়, ঈষৎ নরম গলায় বলে—থাক্ থাক্, ব্যস্ত হবার দরকার নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে, কিরীটীর বিষয়ে একটা কিছু স্থির করে ফেলা উচিত নয় কি? সত্যি কিছু আর এভাবে অনিশ্চিতের আশায় দিন কাটিয়ে বসে থাকবার মত সস্তা ছেলে ও নয়, শুধু তোমাকে একটু বিশেষ পছন্দ করে ফেলেছে বলেই এখনো তোমার এসব খামখেয়াল সহ্য করছে। কিন্তু জেনে রেখো সুযোগ বার বার আসে না। অবশ্য ওকেও যদি তোমার পছন্দ না হয় আলাদা কথা, কিন্তু তা না হলে বলবো সেটা তোমার পক্ষে রীতিমত দুর্ভাগ্য।

—ভাগ্যটা তো আমার নেহাতই দুর্জ্জন মা, নতুন করে আর কি বদলাবে তুমি?

যদিও তাপসী পরিহাসের ছলেই আপন ভাগ্যের নিন্দা করে, তবু মনে হয় ব্যঙ্গের আড়ালে কোথায় যেন রহিয়াছে হতাশার সুর।

চিত্রলেখার মাতৃহৃদয় কাঁপিয়া ওঠে—মুখরা হউক, রুক্ষ মেজাজী হউক, তবু মা। এই যে আজ দশ-বারো বৎসর যাবৎ লড়িয়া আসিতেছে চিত্রলেখা—মেয়ের সেই পুতুল খেলার বিয়েটা নাকচ করিয়া ফেলিবার চেষ্টায়, সে কার জন্ম? মেয়েটা সুখী হোক, সংসার করুক, জীবনকে উপভোগ করিবার পথ খুঁজিয়া পাক, এই না উদ্দেশ্য?

বিগলিত স্বরে বলে—ভাগ্য কেন খারাপ হবে? কখনই না। মানুষের অবিবেচনার ফলে যে দুর্ভাগ্য, সে দুর্ভাগ্যকে কেন স্বীকার করে নেবো আমরা? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বেবি, এত লেখাপড়া শিখে তুমি এখনো এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছো!

তাপসী হাসিয়া ফেলিয়া বলে, সেটা খুব মিথ্যে নয় মা, তোমার মতন অত সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি এখনো, ভবিষ্যতে যদি পারি দেখা যাবে।

পূর্ব্বতন সেই 'বিবাহ' নামক খেলাটার নাম আর স্পষ্ট করিয়া কেহই উল্লেখ করে না, শুধু কথার যুদ্ধ চলে। চিত্রলেখা মেয়ের বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া বলে—এই যদি তোমার উচ্চ আদর্শ হয়, তা হলে ও ছেলেটাকে টাঙিয়ে রেখে ফ্লার্ট করবার তো কোন মানে দেখি না।

—মা! ছি!

চিত্রলেখা কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মনে মনে একটু যে কুণ্ঠিত হয় নাই তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ করাও সম্মানজনক নয়, তাই আরো জেদের সঙ্গে বলিয়া

বসে—নিশ্চয়ই তো, নিজের ব্যবহার নিজে বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার হয়নি এটা বলবে না অবশ্যই? কিসের আশায় সে যখন তখন এসে দোরে ধর্না দেয় —রাশ রাশ টাকা খরচা করে? এত দিনে অনায়াসে জবাব দিতে পারতে তুমি। দেওয়া উচিত ছিল।

তাপসী বিরক্তি-গম্ভীরস্বরে বলে—কে কিসের আশায় কি করছে, তার জন্যে আমি দায়ী হতে যাবো কি দুঃখে? আর জবাবের কথা যদি বলো, মিছিমিছি গায়ে পড়ে জবাব দিতে যাব কেন? প্রশ্ন যদি আসে, জবাব দিতে দেরি হবে না তা দেখো।

মেয়ের এ হেন কথা শুনিয়া চিত্রলেখা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এটা কিছু বিচিত্র নয়। দীর্ঘকাল যাবৎ যে আশাতরুর মূলে জল-সিঞ্চন করিয়া আসিতেছে—মেয়ে যদি এক কথায় তার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বসে, মনের অবস্থা কেমন হয়?

তাপসীর সঙ্গে মুখোমুখি কোন কথাই কোনদিন হয় নাই এটা ঠিক, তবু চিত্রলেখার নিশ্চিত ধারণা ছিল—এতদিনে মেয়েটা নিজেকে কুমারী কন্যা বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং মনে মনে ভবিষ্যতের রঙিন ছবি আঁকিতেছে, কিন্তু আজকের কথাবার্তাগুলো তো তেমন সুবিধাজনক নয়। শেষ পর্য্যন্ত এমনি গণ্ডমূর্খ হইল মেয়েটা? এত বড় জীবনটা কাটাইবার একটা অবলম্বনও কি প্রয়োজন হইবে না? বিধবা তবু স্বামীর স্মৃতি বুকে ধরিয়া—আচ্ছা বিধবা-বিয়েও তো হয়। এক যুগ আগেকার সেই ধূমকেতুর মত সর্ব্বনেশে অপয়া ছেলেটা বাঁচিয়া আছে কিনা সন্দেহ! শোনা গিয়াছিল তিন কুলে নাকি কেহ নাই তাহার—তবে? এখনো কি আর টিঁকিয়া থাকা সম্ভব? টাকাকড়িগুলা পাঁচজনে ভুলাইয়া লইয়াছে, ছেলেটা হয়তো—

সব চিন্তাগুলি মনের মধ্যে ভিড় করিয়া উঠিতেই দিশাহারা চিত্রলেখা ক্রুদ্ধ আর তীব্র প্রশ্ন করে—তুমি তা হলে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, কেমন? তা হবে নাই বা কেন? তোমার নানি তো স্বেচ্ছাচারী হবার রাস্তা খুলেই দিয়ে গিয়েছেন। কারুর মুখাপেক্ষী তো নও! জমিদারির মালিক—

নিতান্ত ক্রোধের বশেই এত বড় কটু কথাটা উচ্চারণ করে চিত্রলেখা। বস্তুতঃ হেমপ্রভার দানপত্র অনুসারে তাপসীই সব কিছুর উত্তরাধিকারিণী হইলেও সেটা নিতান্তই অভিনয়ের মত—চিত্রলেখাই সব। তাছাড়া বুদ্ধি-বিবেচনা হইবার পর হইতেই তাপসী ক্রমাগতই এই ব্যাপারটার প্রতিবাদ করিয়া

আসিতেছে, কিন্তু প্রতিকার এখনো কিছু হইয়া উঠে নাই। কিন্তু সেই কথা লইয়া যে এমন তীক্ষ্ণ খোঁচা মারিবে চিত্রলেখা, এইটাই ধারণা ছিল না তার।

মর্ম্মাহত তাপসী কি একটা বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় সিদ্ধার্থ আসিয়া সংবাদ দিল—মা, দিদি, মিস্টার মুখার্জ্জি এসেছেন!

বেপরোয়া কিশোর তরুণ, তবু বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় মিস্টার মুখার্জ্জি সম্বন্ধে মনোভাবটা নেহাতই বিগলিত। দিদি অগ্রাহ্য অবহেলার ভাব দেখাইলে দিদিকে তিরস্কার করিতে ছাড়ে না।

শুধু অমিতাভকেই নিরপেক্ষ মনে হয়।

চিত্রলেখা হতাশভাবে দুই হাত উল্টাইয়া বলে—আর মিস্টার মুখার্জ্জি!

সিদ্ধার্থ বিস্মিতভাবে বলে—কি হলো?

—কিছু নয়, তোমার দিদির সিনেমা যাওয়ার রুচি নেই।

সিদ্ধার্থ মার কথার উত্তরে বিরক্তভাবে বলে—বাঃ, মজা মন্দ নয়! দাদা বললে 'যাবো না,' দিদি এখন ওই বলছে, আমিই বুঝি বোকার মত যাবো শুধু?

তাপসী মৃদু হাসিয়া বলে—কেন অভীর কি হলো?

—কি আবার হবে, হয়েছে মান। মেয়েদের মত কারুর সঙ্গে যাবেন না বাবু, নিজের কি হাত-পা নেই? হাত-পা যেন আমারই নেই, তবু ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে কিনা?

—নিশ্চয়ই আছে। তাপসী হাসিয়া ফেলিয়া বলে—ভদ্রতা রাখতে নিশ্চয় যাওয়া দরকার—কি বল সিদ্ধার্থবাবু? তাছাড়া মেয়েদের তো আবার নিজের হাত-পাও নেই, কারুর সঙ্গে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

নিতান্ত স্বচ্ছন্দগতিতে সিদ্ধার্থর সঙ্গে নীচে নামিয়া যায় তাপসী। সন্দেহ নাই মিস্টার মুখার্জ্জির উদ্দেশ্যেই।

চিত্রলেখা মেয়ের গমনপথের পানে যে দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন, তাহার সংজ্ঞা পাওয়া ভার। ক্রোধ? ক্ষোভ? ঘৃণা? অবিশ্বাস? না হতাশা? —মেয়েকে বুঝিতে না পারার হতাশা!

বারান্দায় গিয়া উঁকিঝুঁকি মারিবার এনার্জ্জি আর থাকে না চিত্রলেখার। বসিয়া বসিয়া এক সময় শুনিতে পান—মোটর বাহির হইয়া গেল। অমিতাভ যায় নাই, কণ্ঠস্বর পাওয়া যাইতেছে বাড়ীতে।

মিস্টার মুখার্জ্জি বা কিরীটীকে যে অমিতাভ বিশেষ সুচক্ষে দেখে না, তা তাহার এড়াইয়া যাওয়ার ভঙ্গীতেই ধরা পড়ে। নিতান্তই অনুরোধে না পড়িলে

কিরীটীর সঙ্গে কোথাও যাইতে চাহে না।

কিন্তু কেন?

ভালো লাগে না—ভালো লাগে না—কিছুই ভালো লাগে না। ভালো লাগিবার সহস্র উপকরণ চারিদিকে থরে থরে সাজানো থাকা সত্ত্বেও—যেন একটা "ভালো না লাগা'র" তীক্ষ্ণ কাঁটা অহরহ বিঁধিয়া থাকে মনের ভিতর। কোনোমতেই দূর করা যায় না সেই অদৃশ্য শত্রুকে। চলিতে, ফিরিতে, খাইতে, শুইতে, এই কাঁটা যেন প্রতিনিয়ত স্মরণ করাইয়া দেয় "তুমি অস্বাভাবিক, তুমি অদ্ভুত, তুমি সৃষ্টিছাড়া। সব কিছুতেই খুশী হইয়া উঠিবার অধিকারী তুমি নও, জন্মলগ্নের ক্রূর পরিহাসে সে যোগ্যতা তুমি হারাইয়াছ।"

খুশী হইতে গিয়াও তাই খুশী হইতে পারে না তাপসী, ঠিক অন্তরঙ্গ হইতে পারে না কাহারও কাছে। পারে না ঠিকমত সহজ হইতে। হাসিতে গিয়া থামিয়া পড়ে, ভালোবাসিতে গিয়া ফিরিয়া আসে। অনেক সময় তাই ব্যবহারটা তাহার সামঞ্জস্যহীন উল্টাপাল্টা, অন্যের কাছে দুর্ব্বোধ্য।

অন্যের কথা দূরে থাক, চিত্রলেখা মা হইয়াও আজ পর্য্যন্ত চিনিতে পারিলেন না তাহাকে, পারিলেন না খুশী করিতে। বাজার উজাড় করিয়া উপহার-সামগ্রী দিয়া নয়, হৃদয় উজাড় করিয়া ভালোবাসা দিয়াও নয়।

তা ছাড়া কিরীটীর কথাই ধরো, তাপসীকে এতটুকু খুশী করিতে পাইলে যে বেচারা ধন্য হইয়া যায়, সে কথা তো আর এখন গোপন নাই। চেষ্টারও ক্রুটি রাখে নাই, কিন্তু পারিল কই! তাপসীর পায়ের কাছে প্রাণটা ঢালিয়া দিলে, বড় জোড় আনন্দ-প্রকাশের প্রসাদ বিতরণ করিতে পারে তাপসী, খুশী হইতে পারে না।

কিরীটী হয়তো ভাবে নিজের ক্রুটি, কিন্তু তাপসী তো জানে ক্রুটি কার! ভালোবাসা পাইয়া খুশী হইবার, ধন্য করিয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্য তাপসীর নয়। শিশু তাপসীকে ঘুঁটি করিয়া যাহারা ইচ্ছামত খেলা করিয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর ক্রোধে ক্ষোভে মাঝে মাঝে যেন হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয় তাপসীর। কিন্তু ইচ্ছাটা তো আর কার্য্যে পরিণত করা চলে না, তাই আগাগোড়া ব্যবহারই তাহার সঙ্গতিহীন দুর্ব্বোধ্য। চিত্রলেখার মত যদি খেলাটাকে খেলার মতই ঝাড়িয়া ফেলিয়া সহজ হইতে পারিত তবে হয়তো বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু পারিল কই? পারে না বলিয়া কিরীটীর সঙ্গে পাশাপাশি

বসিয়া সিনেমা দেখিতে দেখিতে মাথার যন্ত্রণায় এত বেশী কাতর হইতে হয় তাহাকে যে 'হল'-এর ভিতর বসিয়া থাকা অসম্ভব হয়।

অমিতাভ অবশ্য আসে নাই, দিদির এলোমেলো ব্যবহার সে বরদাস্ত করিতে পারে না, কিন্তু আজকের ব্যবহারে সিদ্ধার্থও কম চটে না। সেও আর এত ছেলেমানুষ নাই যে দিদির এসব যে "ঢং ছাড়া আর কিছু নয়" এটুকু বুঝিতে অক্ষম হইবে? এমন ভাল ছবিখানা দেখিতে দেখিতে মাঝখানে হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার বায়না লইলে কেই বা না চটে? তাই মনের রাগ মনে চাপিয়া গম্ভীরভাবে বলে—সে কি মিস্টার মুখার্জ্জি, আপনি কেন যাবেন? বরং আমিই দিদিকে নিয়ে—

কিরীটী ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেয়—না-না, আরে। তুমি বোসো না, আমি ওঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আবার এসে জুটছি দেখো না। যাবো আর আসবো—

'তা আর নয়'—সিদ্ধার্থ মনে মনে বলে—'গিয়ে আবার আপনি এখুনি আসবেন। তা হলে আর ভাবনা ছিল না—ড্রইংরুমে ঘণ্টাখানেক, সিঁড়ির সামনে আধঘণ্টা, গেটের ধারে কোন্ না মিনিট কুড়ি! ততক্ষণে আর একটা শো শুরু হয়ে যাবে।'

যাক্, মনে মনে কি না বলে লোকে! ভদ্রতাটা বজায় রাখিতে বলিতে হয়—দেখুন দিকি কী অন্যায়! মাঝখান থেকে আপনারও দেখা হলো না। দিদির এই এক রোগ—মাথাধরা! যখন-তখন মাথা ধরলেই হলো!

দিদিটি ততক্ষণে 'গট্‌গট্' করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। ব্যবহারে চক্ষু-লজ্জার বালাই মাত্র নাই। অসময়ে মাথা ধরাইয়া অপরের ক্ষতির কারণ হইলে যে লোক-দেখানো কুণ্ঠার ভাবও দেখাইতে হয় এটুকু সভ্যতার রীতিও মানিয়া চলিতে রাজী নয় যেন।

কিরীটী গাড়ীর দরজা খুলিয়া সরিয়া দাঁড়ানো পর্য্যন্ত একটি কথাও বলে না তাপসী। গাড়ীতে উঠিয়া জুৎ করিয়া বসার পর বলে—আপনি ছবিটা ছেড়ে না এলেও পারতেন, আমি কি আর এটুকু একলা যেতে পারতাম না?

—নিশ্চয়ই পারতেন। কিন্তু আমার একটা কর্ত্তব্য আছে অবশ্যই।

—কর্ত্তব্য? ওঃ!

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না, মনে হয় যেন উত্তর খুঁজিতেছে, কিন্তু মিনিট কয়েক পর্য্যন্ত কিছুই বলে না, জনবহুল পথে সাবধানে গাড়ীটি চালাইয়া

যায় মাত্র।

কিছুক্ষণ কাটে—তাপসীই হঠাৎ প্রশ্ন করে—অথবা ঠিক প্রশ্নও নয়—কথা। নীরবতাকে এড়াইবার জন্য অর্থহীন কথা একটা।

—বাবলু খুব চটে গেল, কি বলেন?

—কেন, চটে যাবে কেন?

উত্তরটা দিয়া হয়তো একবার মুখ ফিরাইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনীর মুখটা দেখিয়া লয়, কিংবা তার মাথা ডিঙাইয়া বাস্তার ওদিকটা। ঠিক বোঝা যায় না।

—কেন? তাপসী অল্প একটু হাসে—অসময়ে এ রকম মাথা ধরালে ও ভারি চটে যায়।

—কেন? ওর তো এ রকম মাথা-ধরা দেখা অভ্যাস আছে।

—তা হলে দেখা যাদের অভ্যাস নেই, তাদেরই চটা উচিত, এই আপনার অভিমত?

—আমার কোন মতামত নেই। অসুখের ওপর তো হাত চলে না।

—আপনি খুব উদার—তীক্ষ্ণ শোনায় তাপসীর কণ্ঠস্বর—আর ধরুন যদি অসুখটা ইচ্ছাকৃত হয়? তা হলেও রাগ হবে না আপনার?

—তাতেও না। কিরীটীর স্বরে আকস্মিক বিস্ময়ের আভাস নাই, যেন জানা কথা, এইভাবেই বলে—সেটা তো হবে আরও হাতের বাইরের ব্যাপার।

—ওঃ, কিছুতেই তাহলে যায় আসে না আপনার?

—এসব কথা এত তাড়াতাড়ি বলা শক্ত।

—থাক্ বলতে হবে না। উঃ, বাড়ী গিয়ে শুতে পেলে বাঁচি!

এবারও কিরীটী নিরুত্তর। উত্তর দেয় বাড়ীর দরজায় নামাইয়া দিয়া—আপনার কষ্টের কারণ হলাম বলে দুঃখিত। কি আর করা যাবে—পৃথিবীতে নির্ব্বোধ লোক তো কিছু কিছু থাকবেই। যাক্, শুয়ে পড়ুনগে তাড়াতাড়ি।

—মা শুতে দিলে তো!

তাপসীর চোখে যেন কৌতুকের আভাস, কিছু আগে যে রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে বোঝা যায় না।

—মা শুতে দেবেন না! তার মানে?

—তার মানে—অসময়ে বাইরে থেকে এসে শুয়েছি দেখলে ডাক্তার না ডেকে ছাড়বেন না।

—তা ডাক্তার আপনার জন্যে ডাকাই উচিত।

—কেন? ব্রেনের চিকিৎসা করাতে?

—ধরুন তাই! সত্যি আপনি কেন যে এমন খাপছাড়া তাই ভাবি বেশ থাকেন, হঠাৎ কি যে হয়!

—একেবারে সাধারণ হওয়াই কি ভালো?

—আমার তো তাই ভালো মনে হয়। আশপাশের লোকেরা একটু নির্ভয়ে পথ চলে।

—ভয় করবারই বা দরকার কি?

—কি জানি, হয়তো বোকামি!

—নিজেকে বোকা ভাবতেও বোধ হয় খুব ভালো লাগে আপনার?

—লাগে না? তবে বোকামি ধরা পড়লে স্বীকার করতে বাধে না। আচ্ছা চলি।

—যাচ্ছেন? ও:, নমস্কার। অবশ্য ফিরে যেতে যেতে ছবিটা ফুরিয়ে যাবে।

—ছবির জন্যেই মরে যাচ্ছি, এই আপনার মনে হয়?

—বা:, মনে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এত তাড়াতাড়ি পালাবার আর কি কারণ থাকতে পারে তবে?

—বেশ। করবো না তাড়াতাড়ি, ছোট সাহেবকে ফিরিয়ে আনার টাইমে গেলেই হলো।

হাতের ঘড়িটা একবার হাত উল্টাইয়া দেখিয়া লয় কিরীটী।

'ছোট সাহেব' অর্থে সিদ্ধার্থ।

—বাবলু রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না নিশ্চয়!

—রাস্তা হারিয়ে কেউ ফেলে না—তবু ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে তো?

—আছে বৈকি। আপনার কাছে তো আবার শুধু ওই একটা জিনিসই আছে। বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ স্বর।

কিরীটী স্পষ্ট সোজাসুজি একবার চাহিয়া দেখে তাপসীর চোখের দিকে। কি চায় তাপসী? কোন উত্তর? কোন প্রশ্ন? কেন ওর স্বভাবে এমন অসঙ্গতি? এক মিনিট চুপ থাকিয়া বলে—এর উত্তর আছে আমার কাছে, কিন্তু আজ হয় না।

—কেন ক্ষতি কি?

কিরীটী আবার কিছু বলিতে গিয়া থামিয়া যায়—অমিতাভও বেড়াইয়া

ফিরিতেছে। বাঁকাচোখে দুইজনের দিকে একবার চাহিয়া টক্‌টক্‌ করিয়া গাড়ী-বারান্দার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া যায়। কথা বলে না।

কিরীটীকে সে দেখিতে পারে না এটা অবশ্য এতদিনে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু এমন স্পষ্ট অবহেলা বড় একটা করে না।

—আচ্ছা ধন্যবাদ, চলি।

তাপসী নিজেও তো সর্ব্বদা ভদ্রতার বিধি মানিয়া চলে না, তবু কি ভাইয়ের ব্যবহারে কুণ্ঠিত হইয়াছে? তা নয়তো অমন দুর্ব্বল আর ফ্যাকাশে শোনায় কেন তার গলা?

—উত্তরটা কিন্তু শোনা হলো না আমার।

—না-হয় না হলো, ক্ষতি কি? সারা দুনিয়াটাই তো প্রশ্নে মুখর, উত্তর কোথায়?—নমস্কার।

এবার সত্যই চলিয়া যায়।

—কি রে কি হলো? চলে এলি যে? মাথা ধরেছে নাকি?

অন্ধকার ঘরে টুক্ করিয়া এতটুকু একটু শব্দ, পরক্ষণেই আলোর বন্যায় ভাসিয়া গেল সব। চিত্রলেখার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের বাকিটা যেন মেয়ের বিছানার কাছে আসিয়া আছাড় খাইল—কখন ফিরেছিস? মাথা ধরলো কেন?

—মাথা ধরার আবার কেন কি? এমন কিছু তো নতুন নয় ব্যাপারটা। তাপসী উঠিয়া বসে।

—নয় তা তো বুঝলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ সিনেমা দেখতে গিয়ে—চিত্রলেখা মেয়ের কাছে বেশ একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া বসে—থাক্ না, উঠছিস্ কেন? বলছি—হঠাৎ এভাবে মাথা ধরা—ইয়ে—কিরীটী কিছু বললে-টললে নাকি?

এত মৃদু কণ্ঠস্বর চিত্রলেখার, যেন ফিস্‌ফিস্ করার মত শোনায়।

—বলবে আবার কি? আর মাথা ধরার সঙ্গেই বা সম্পর্ক কি তার? বিরক্তি গোপন না করিয়াই উত্তর দেয় তাপসী।

—না, মানে—তাই বলছি! ইয়ে—একটা কিছু না হলে—

—তুমি কি বলতে চাও, বলো তো স্পষ্ট করে! তীব্রস্বরে প্রশ্ন করে তাপসী।

মেয়ের স্বরের তীব্রতায় চিত্রলেখার যেন আত্মমর্যাদা ফিরিয়া আসে। স্বরের তীব্রতায় মেয়েকে কি আর হার মানাইতে পারে না সে? খুবই পারে, নেহাৎ

মেয়ের উপর সহৃদয়তা দেখাইতে আসিয়াছে বলিয়াই না! কি জানি, কিরীটীর কোন ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াই বিছানা লইয়াছে কিনা বেচারা! অবশ্য কিরীটী তেমন ছেলে নয়, কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যেরও তো সীমা আছে একটা। নিজের মেয়ের মেজাজটিও তো জানিতে বাকি নাই তাহার! আর কিছু নয়—ওই যে সিঁথি-টিঁতি পরিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার বেশে সিনেমায় যাওয়া, সেই সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকিবে। অথবা—কি জানি হয়তো বা তাও নয়—বিবাহের প্রস্তাব!

কিন্তু যাই হোক, আর নরম হইবে না চিত্রলেখা, তীব্রস্বরের টেক্কা দিয়া সেও বলে—কি বলতে চাই সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি অবশ্যই আছে তোমার, এমন কচি খুকী নও। বলতে চাই কিরীটী আজ প্রোপোজ করেছে কিনা! ·

নিজের আমলের ভাষাই ব্যবহার করে সে।

প্রোপোজ!

তাপসী হঠাৎ হাসিয়া ফেলে—ঠিক আন্দাজ করেছ দেখছি।

চিত্রলেখা ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে বলে—সত্যি বলছিস্ তো? কি ভাবে—মানে ঠিক কি বললে বল দিকি?

—বাবলুকে জিজ্ঞেস করো না, ছিলই তো কাছে!

যেন বাবলুকে সাক্ষী রাখিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছে কিরীটী! শোনো কথা!

—বাবলু তো এই এলো, তার মুখেই শুনলাম যে তুমি আগে চলে এসেছো। ডিরেক্ট বাড়ীই চলে এসেছিলে, না ময়দানের দিকে একটু ঘুরে-টুরে—

চিত্রলেখার কথার ছাঁদে যেন কেমন একটা স্থূল লোলুপতা—যেন কথার প্যাঁচে ফেলিয়া মেয়ের কাছ হইতে কী একটা গোপন তথ্য জানিয়া লইতে চায়।

—পাগলামি কোরো না বেশী! বিছানা হইতে নামিয়া পড়িয়া টেবিলের ধারে আসিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া বসে তাপসী।

—হোপলেস্! বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করে চিত্রলেখা।

হায়! চিত্রলেখার মত নির্লজ্জ কি আর কেউ আছে জগতে? এখনও সে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিতে যায়, ভালো করিতে চেষ্টা করে! বাবলুকে প্রশ্ন করিবার রুচিও থাকে না। যা খুশি করুক সব।

মা চলিয়া যাইতেই ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়ে তাপসী। মাথা ধরাটা মিথ্যাই বা বলা চলে কি করিয়া? মাথার মধ্যে যেন

ছিঁড়িয়া পড়িতেছে।—সত্যিই বটে, কতদিন আর এভাবে চালানো যাইবে? নিজের মনের চেহারা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে ভয় করে আজকাল। এই দুরন্ত আকর্ষণকে কতদিন আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে তাপসী? কোন্ মন্ত্রের জোরে? কোন্ দেবতার দোহাই দিয়া? সেই প্রচণ্ড আকর্ষণের সংস্রব ত্যাগ করিবার প্রবল সংকল্প প্রতিদিনই কত সহজে ভাঙিয়া পড়ে।

অথচ—না না, কিছুতেই না, সে অসম্ভব। সম্পূর্ণ অসম্ভব।

চিত্রলেখার সহজ হিসাবের সঙ্গে তাপসীর হিসাব মেলানো সম্ভব নয়।

ভাবা গিয়াছিল—কিরীটী আর সহজে আসিবে না। যতই হোক মান-মর্যাদা বলিয়া একটা জিনিস তো আছে মানুষের। কিন্তু দু'জনের ধারণা উল্টাইয়া দিয়া পরদিনই নিতান্ত নির্লজ্জের মত আসিয়া হাজির হইল লোকটা। কি না, তাপসীর খোঁজ লইতে আসিয়াছে। তাপসীর মাথা-ব্যথার চিন্তায় বোধ করি সারারাত ঘুমই হয় নাই তাহার। দৈবক্রমে আসামাত্রই তাপসীর দেখা পাওয়ায় প্রসন্ন হাসির আলোয় যেন ঝক্‌মক্ করিয়া ওঠে কিরীটী, শরতের সোনালী সকালের সঙ্গে ওর মুখের হাসিটা ভারি মানানসই।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

পিঠের আঁচলটা টানিয়া হাতের উপর জড়াইয়া লইতে তাপসীও হাসিমুখে বলে—হঠাৎ ঈশ্বরের উপর এত অনুগ্রহ?

—তাঁর অশেষ করুণার জন্যে। আশা করি নি, এসেই এভাবে আপনার দেখা পাওয়া যাবে, মানে ইয়ে—এমন সুস্থভাবে।

হঠাৎ প্রকাশিত আবেগের ভাষাটাকে মোড় ঘুরাইয়া একটু সরল করিয়া লয় কিরীটী। যেন ধন্যবাদটা যদি ঈশ্বরের পাওনাই হয় তো সে কেবল তাপসীকে শারীরিক সুস্থ রাখার দরুন।

তাপসী মনে মনে হাসিয়া লইয়া বলে—তবে কি আশা করেছিলেন, মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছি, ডাক্তার-বদ্যিতে বাড়ী ভরে গেছে, 'যায় যায়' অবস্থা!

—আঃ, কি যে বলেন! আপনাকে এক এক সময় ভারি বকতে ইচ্ছে করে সত্যি!

তাপসী হাসিয়া ফেলিয়া বলে—বকুন!

—বকবো? নাঃ, এরকম 'আপনি আজ্ঞে' করে বকে সুখ হয় না!

—তবে নয় 'তুই-তোকারি'ই করুন!

—হঠাৎ একেবারে ডবল প্রমোশন? অতটা ক পেরে উঠবো। মাঝামাঝি একটা রফা করতে আপত্তি কি?

আপত্তি? আপত্তি আবার কোথায়? দূরত্বের সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া সমস্ত হৃদয় যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায় ওই উন্মুখ হৃদয়ের দরজায়। কিন্তু না না, 'তুমি' সম্বোধনের নিকট-আবেষ্টনের মধ্যে তাপসী আপনাকে রক্ষা করিবে কিসের জোরে? আগুন লইয়া এই ভয়াবহ খেলায় হার মানিতে হয় যদি? কিরীটীকে দেখিলে নিজেকে বাঁধিয়া রাখা যে কত কঠিন সে কথা তো নিজের কাছে আর অজানা নাই আজ। গতরাত্রের কত প্রতিজ্ঞা কত সংকল্প কোথায় ভাসিয়া গেল এই খুশীতে ঝল্‌মল্ মুখখানি দেখাব সঙ্গে সঙ্গে। তবে? বরং কঠিন ব্যবহারের নিষ্ঠুর আঘাতে দূরে সরাইয়া রাখা সম্ভব, কিন্তু সম্প্রীতির সরসতার মধ্যে নয়।

হায় ঈশ্বর। তাপসী করিবে কি? অতীতের দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া, কাল্পনিক অপবাধেব বিভীষিকা ভুলিয়া, শরতের এই নরম সোনালী আলোব মত নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিবে? ন্যায়-অন্যায়েব বিচাবই যদি করিতে হয়—এই আগ্রহে উন্মুখ হৃদয়টিকে ফিরাইয়া দেওয়াই কি ন্যায়? ওই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি ম্লান করিয়া দেওয়াই কি সুবিচার? নিজের হৃদয় শতধা হোক, হয়তো সহ্য করা যায়, কিন্তু কিরীটী? কিরীটীকে ফিরাইয়া দিবার জোর যে আজ আর কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না তাপসী—দূর অতীতের একখানি বিস্মৃত মুখ স্মরণ করিবার প্রাণপণ ব্যর্থ চেষ্টায় নয়, নয় নীতিধর্মের খুঁটি আকড়াইয়া থাকিবার প্রাণান্ত চেষ্টায়।

সকালের খোলা আলোয় মুখের লেখা পাঠ করা শক্ত নয়।

'তুমি' বলিতে চাওয়ার আবদারে তাপসীর মুখের আলোছায়ার খেলা কিরীটীর চোখে ধরা পড়ে সহজেই।

তবু কি ভাবিয়া 'তুমি'ই বলে সে!

ম্লান গম্ভীর মুখে বলে—আপত্তি আছে বুঝলাম। তবু মানলাম না তোমার আপত্তি! একটা কথা তোমাকে আমার জানাবার আছে তাপসী, শোনবার সময় হবে আজ?

কথা যে কি, সে কথা কি বুঝতে বাকি আছে তাপসীর? চিত্রলেখার বড় আকাঙ্ক্ষার সেই কথা! কিন্তু তাপসীর? তাপসীর সে কথা শুনিবার সময় কোথায়? আজ নয়, কাল নয়, কোনোদিনই নয়।

মনকে সে ঠিক করিয়াছে।

তাই অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলে—না।

—কিন্তু সে কথা যে আমায় বলতেই হবে, না বলে উপায় নেই। না বলতে পেরে—

—কি আশ্চর্য্য! আপনার দরকার আছে বলেই সকলের দরকার হবে তার মানে কি? আপনার কথা হয়তো আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়।

তেমনি মুখ ফিরাইয়াই কথা বলে তাপসী।

কিরীটী কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে কোন অপমানেই টলিবে না? তা নয়তো এত অবহেলার পরেও এমন ব্যগ্রভাবে কথা কয়?

—তুমি বুঝতে পারছো না তাপসী, শোনবার প্রয়োজন হয়তো তোমারও আছে! আরও আগেই বলা উচিত ছিল আমার, শুধু গুছিয়ে বলতে পারার ক্ষমতার অভাবেই পারি নি। সাহস করি নি। কিন্তু এভাবে আর পারছি না আমি।

আর তাপসীই যেন পারিতেছে!

প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে কত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে বেচারা, কে তাহার হিসাব রাখিতেছে! কে সন্ধান লইতেছে সে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয়ের!

কিরীটীকে দেখিবার আগে কী স্নিগ্ধ শান্তি ছিল জীবনে!

সুখ না থাক্—একটা ছায়াচ্ছন্ন শান্তি, নিশ্চিন্ত বিষাদ। অকালবৈধব্যের মত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সকরুণ নির্লিপ্ততা!

তখন এমন রাত্রির ঘুম হরণ করিয়া নিঃশব্দ প্রেতের মত অতীত আসিয়া বর্ত্তমানের উপর ছায়া ফেলিত না, ছদ্মবেশী শয়তানের মত ভবিষ্যৎ আসিয়া লোভ দেখাইত না।

কিরীটীকে দেখিবামাত্র মনের সেই স্থির প্রশান্তি এমন বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল কেন? এই চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কখনো কি কোন পুরুষকেই চোখে দেখে নাই তাপসী? চিত্রলেখারও তো এইটিই নূতন প্রচেষ্টা নয়। মেয়ের জন্য পাত্রের আমদানি তো অনেকদিন হইতেই করিতেছেন। তা ছাড়া বাইরের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে গেলে কত মানুষের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তবু—

ব্যর্থ যৌবনের কত বসন্তই তো অনায়াসে পার হইয়া গেল।

আর কিরীটীর কণ্ঠস্বর শুনিলেই কেন শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় আসিয়া

জমা হয়? মুখ দেখিলে কেন সমস্ত ভুল হইয়া যায়?

বন্ধুর বেশে এ পরম শত্রু!

কিরীটীর আবার না পারিবার আছে কি? নিজের সঙ্গে এমন যুদ্ধ করিতে হয় তাহাকে? বড় জোর, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, তার বেশী নয়। নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণার ধারণা কি কিরীটীর আছে?

হঠাৎ কেমন রুক্ষ শোনায় তাপসীর গলার স্বর।

—আমি পারছি না আর। দয়া করে রেহাই দিন আমায়।

—দয়া! রেহাই! আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না তাপসী!

—বুঝতেও হবে না কষ্ট করে। এইটুকু জেনে রাখুন আপনার সংস্রব আমার অসহ্য।

না, কিরীটীও আহত হয় তবে! ছাইয়ের মত সাদা দেখায় কেন তাহার মুখটা?

—জানলাম! এদিকটা সত্যিই ভেবে দেখি নি কোনদিন। নিছক ভদ্রতা রক্ষার দায়ে তবে কী দুর্ভোগই ভুগতে হয়েছে তোমাকে, আর তারই সুযোগে এতদিন অনর্থক বিরক্ত করে এসেছি আমি। যাক্ নির্ব্বোধ লোক তো থাকবেই পৃথিবীতে, কি বলো? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে—যা বলবার ছিল সেটা বলে ফেলি নি। বললে হয়তো শুধু নির্ব্বোধই বলতে না, পাগল বলতে!—আচ্ছা চলি।

সত্যই চলিয়া গেল।

তাপসীর মুখের কথাটাই সত্য বলিয়া জানিয়া গেল তবে?

কিন্তু এ কি শুধু কথা? তীক্ষ্ণ তীর নয় কি? তীক্ষ্ণ আর বিষাক্ত?

আহারের টেবিলে গত সন্ধ্যার কথাটা পাড়িল সিদ্ধার্থ।

দিদির 'ঢং' লইয়া দিদিকে দুই ভায়ে খানিকটা বাক্যযন্ত্রণা দেওয়ার শুভবুদ্ধির বশেই বোধ করি কথাটা পাড়িয়াছিল বেচারা, কিন্তু অমিতাভ ঘটনাটা শোনামাত্রই জ্বলিয়া উঠিয়া বলে—চলে এসে এমন কিছু বাহাদুরি হয় নি, উচিত ছিল না যাওয়া। কিন্তু সকালবেলাই আবার কি করতে এসেছিল ওটা? মান-অপমানের লেশ নেই?

সিদ্ধার্থ অবাক হইয়া বলে—ওকি রে দাদা, ভদ্রলোকের সম্বন্ধে হঠাৎ এরকম

বেপরোয়া কথাবার্ত্তা বলছিস্ যে?

—আরে যা যা, রেখে দে তোদের ভদ্রলোক! ভদ্রলোক হলে ভেতরে একটু আত্মসম্মান-জ্ঞান থাকতো।

সিদ্ধার্থ বরাবরই কিছুটা কিরীটীর দিকে ঘেঁষা, তাই তর্কের সুরে বলে— নেই তারই বা কি প্রমাণ পেলি হঠাৎ?

—চোখ থাকলেই দেখতে পেতিস! নেহাৎ মার আদরের অতিথি বলেই চুপচাপ থাকি, নইলে একদিন আচ্ছা করে এমন শুনিয়ে দিতাম যে ভদ্রলোককে আর এ বাড়ীর গেট্ পার হতে হতো না।

সিদ্ধার্থর অবশ্য কিরীটীর উপর দাদার অকারণ এই তিক্ত ভাবের খবরটা কিছু কিছু জানা ছিল, কিন্তু এমন প্রকাশ্যে যুদ্ধ-ঘোষণায় সত্যই অবাক হইয়া যায় এবং অমিতাভর মন্তব্যটা দিদির মুখচ্ছবির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিল, আড়নয়নে একবার দেখিয়া লইয়া বলে—কি ব্যাপার বল্ তো দাদা? মিস্টার মুখার্জ্জি তোর কাছে টাকা ধার করে শোধ দিতে ভুলে যান নি তো?

—যা যা, বাজে-মার্কা ইয়ার্কি করতে হবে না। আমি জানতে চাই, ও যখন-তখন এ বাড়ীতে আসে কি করতে? কি দরকার ওর?

তাপসী এতক্ষণ নিরপেক্ষভাবেই মাছের কাঁটা বাছিতেছিল, এখন অমিতাভর কথা শেষ হইতেই সহসা আরক্তমুখে বলিয়া ওঠে—বাড়ীটা আশা করি তোমার, একলার নয়?

চশমার কোণ হইতে অবহেলাভরে একবার দিদির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অমিতাভ উত্তর দেয়—আজ্ঞে জানা আছে সে কথা, এবং সেই জন্যেই বেশী কিছু বলি না।

—ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসবে এতে বলবারই বা কি আছে রে বাপু তাও তো বুঝি না।

সালিশীর সুরে সিদ্ধার্থ আপন মতামত ব্যক্ত করে। কিন্তু অমিতাভ নিবৃত্ত হয় না, আরো তীক্ষ্ণস্বরে বলে—ভদ্রলোক যদি শুধু ভদ্রভাবে লোকের বাড়ী বেড়াতে আসে কিছুই বলার থাকে না, কিন্তু একটা মতলব নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে ঘৃণা করবোই। শুধু তাকে নয়—যারা তাকে প্রশ্রয় দেয় তাদেরও।

অর্থাৎ মাকে দিদিকে সে আজকাল ঘৃণা করিতেই আরম্ভ করিয়াছে।

তাপসীকে উত্তেজিত হইতে বড় একটা দেখা যায় না, মার সঙ্গে কথা কয়

এত ঠাণ্ডা মাথায় যে চিত্রলেখাই জ্বলিয়া যায়। কিন্তু অমিতাভর কথায় বড় বেশী উত্তেজিত দেখায় তাহাকে।

উত্তেজনার মুখে তর্কের খাতিরে হয়তো বা নিজের মতবিরুদ্ধ কথাই বলে। কিংবা মতবিরুদ্ধ নয়ও—নিজের মনের আসল চেহারা নিজেরই জানা নাই তাহার, উত্তেজনার মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বলে—তাই যদি হয়, সেটা কি খুবই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড হবে তুমি মনে করো অভি? এতই যখন বুঝতে শিখেছো—এটুকুও বোঝা উচিত ছিল—তোমার ভাষায়—'মতলব নিয়ে ঘোরাঘুরি করাটা' অসম্ভব কিছুই নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

—হতো না—যদি বাড়ীর সকলের জীবনটাও ঠিক স্বাভাবিক হতো। বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায় অমিতাভ।

সন্দেহের অবকাশ আর থাকে না। বোঝা যায় চিত্রলেখার শিক্ষা সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছে। অতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ অমিতাভর চিত্তবৃত্তিও শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে পিতামহীর আমলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার বনভূমিতে!

তাপসীর সেই খেলাঘরের বিবাহটাকে 'খেলা' বলিয়া উড়াইয়া দিবার সাহস বা ইচ্ছা তাহারও নাই। তাই তাপসীর প্রণয়লাভেচ্ছু কিরীটীকে দেখিলে আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায় তাহার, আর যদিও তাপসী 'বড়ত্বের' দাবী রাখে, তবু 'দাদাগিরি' ভাবটা বরাবর অমিতাভ ফলাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই নিজের বিরক্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু তাপসীই বা হঠাৎ এত জোর পাইল কোথায়?

নিজের বিষয়ে সাহস করিয়া বলিবার মত জোর! অমিতাভর কাছে তো চিরদিনই কাঁদিয়া পরাজয় মানিয়া আসিয়াছে সে।

অথচ যা বলে চিত্রলেখা শুনিলে অবাক বনিয়া যাইত।

—স্বাভাবিক নয় বলে যে তাকে স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টামাত্র করে ভাসিয়ে দিতে হবে, জীবন জিনিসটা কি এতই সস্তা অভী?

—তা বেশ তো, জীবনটা দামী করে তোলো না! অমিতাভর স্বরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ—বরং মার মনে একটা সান্ত্বনা থাকবে যে একজনও মানুষ হলো। তবে এও জেনো, এ বাড়ীর ভাত বেশী দিন বরদাস্ত করা আমার পক্ষে শক্ত।

—কি বাজে বাজে বকছিস দাদা ?

সিদ্ধার্থ কথাবার্ত্তার স্বর লঘু করিয়া আনিতে চেষ্টা করে।

অমিতাভ কিছু বলিবার আগেই রঙ্গস্থলে আসিয়া হাজির হয় চিত্রলেখা, মনে হয় যেন আগাগোড়া বর্ম্মাবৃত অবস্থায় সাঁজোয়া গাড়ীতে চড়িয়া একেবারেই ফিল্ডে নামিয়াছে সে। 'রণং দেহি'র স্বরেই বলে—দেখো বেবি, অভী তুমিও রয়েছো ভালই—আমি আজ সন্ধ্যায় একটা পার্টি দিতে চাই! মিস্টার মুখার্জ্জি হবেন তার প্রধান অতিথি। বেবির এন্‌গেজমেণ্টটা আজ পাঁচজনের সামনে পাকাপাকি করিয়ে নিয়ে তবে আমার কাজ। এভাবে বেশীদিন সমাজের সকলের আলোচনার বস্তু হয়ে থাকা আমার রুচিবিরুদ্ধ।

চিত্রলেখার কপাল জোড়। এইমাত্র অমিতাভর সঙ্গে ঝগড়ায় জিতিতে গিয়া এরকম কথা বলিয়া বসিয়াছে তাপসী, এখন অমিতাভর সামনেই বা মার কথার প্রতিবাদ করে কোন্ মুখে!

আড়চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকাইয়া লয় চিত্রলেখা—না, কোনো প্রতিবাদ আসিল না। ভাগ্যিস! খুব ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারা হইয়াছে। হুঁ বাবা, এইবার ধরা পড়িয়া গিয়াছো। যতই হোক, চিত্রলেখার বুদ্ধির কাছে তোদের বুদ্ধির গুমর!

অবশ্য বিধাতাপুরুষও এবার চিত্রলেখার সহায় হইয়াছেন।

বেবির গতরাত্রের নাহোক্ 'মাথাধরা'র পর ভোরবেলাই কিরীটীর 'হন্সে' হইয়া ছুটিয়া আসা এবং তখন দিব্য সপ্রতিভ বেবির তাহার সঙ্গে সপ্রেম হাস্য-পরিহাসের দৃশ্যটা—দোতলার জানালা হইতে যা-ই চোখে পড়িয়াছিল তাহার, তাই না এত সাহস।

যা ভাবিয়াছিল সে তাছাড়া কিছুই নয় বাপু, বুঝিতে বাকি নাই তাহার। কালকের কিছু একটা বেয়াদবির জন্যই অপরাধী ব্যক্তিটি সকাল না হইতেই ছুটিয়া আসিয়াছিল মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে।

আসিবেই তো—মেয়েদের চিনিতে যে এখনো অনেক দেরি আছে তাহার। শুধু তাহার কেন, গোটা পুরুষ জাতটারই। কিন্তু চিত্রলেখা তো আর পুরুষ নয় যে জানিতে বাকি থাকিবে তাহার—বেয়াদবিটাই পছন্দ করে মেয়েরা।

বরং প্রার্থিত বেয়াদবির অভাব দেখিলেই অসহিষ্ণু নারীপ্রকৃতি খাপ-ছাড়া ভাবে বিগড়াইয়া যায়।—কিন্তু এমন মূল্যবান তথ্যটা তো আর ভাবী জামাতাকে শিখাইয়া দিবার বিষয় নয়! দিবার হইলে এতদিনে কিরীটীর

ব্যাপারের সুরাহা হইয়া যাইত।

অমিতাভ মার দিকে ও বোনের দিকে এক সেকেণ্ড তাকাইয়া লইয়া বলে —পার্টি দেবে—সেটা তোমার বিজনেস, তাতে আমাদের অনুমতির দরকার হবে না নিশ্চয়ই?

—অনুমতির দরকার হবে, এখনো এতটা দুর্ভাগ্য হয় নি বলেই বিশ্বাস। তবে কিছুটা সাহায্যের দাবি রাখি। আমি এখন যাদের যাদের বলবার বলতে বেরোচ্ছি—ঘুরে এসে নিমন্ত্রিতদের একটা লিস্ট তোমায় দেবো, তুমি কয়েকটা জিনিস আমায় এনে দেবে, আর নিউমার্কেট থেকে কিছু ফুল। খাবার-টাবার সম্বন্ধে আমি নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করবো, তোমাদের কোনো ভার দিতে চাই না।

—গাড়ী ঘুরিয়ে নিউমার্কেট থেকে ওই সামান্য জিনিস কটা আর ফুলও তুমি অনায়াসেই আনতে পারো মা, ওর জন্যে আর আমাকে ভার দিয়ে খেলো হবে কেন? তা ছাড়া আমি আজ বাড়ী থাকছি না—বলিয়া অমিতাভ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়।

—চমৎকার ভাগ্যটি আমার বটে। চিত্রলেখা উল্টানো দুই হাতের সাহায্যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া অমিতাভর পরিত্যক্ত চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে—সতীনের ছেলেমেয়েকে প্রতিপালন করলেও বোধ হয় এর থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া যেতো তাদের কাছ থেকে।

ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সহযোগিতা না পাইলেও চিত্রলেখা অনুষ্ঠানের ত্রুটিমাত্র রাখিল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সৌষ্ঠবসম্পন্ন ভাবে কাজ করা যে একমাত্র চিত্রলেখার পক্ষেই সম্ভব সে কথা তাহার পরম শত্রুতেও অস্বীকার করিতে পারিবে না।

সম্ভব হইয়াছে কি আর অমনি?

সমস্ত জীবনটাই চিত্রলেখা উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে কাহার পায়ে?

ওই সভ্যতা-সৌষ্ঠবের পায়েই নয় কি?

প্রতিনিয়ত পারিপার্শ্বিক সমস্ত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, স্বামী-সন্তান সকলের সহিত বিরোধ করিয়া আসিয়াছে, নিজে মুহূর্তের জন্য বিশ্রামের শান্তি উপভোগ করিতে পায় নাই, তবু হাল ছাড়ে নাই।

তাই না আজ দশের একজন হইয়া সমাজে বিচরণ করিতেছে !

তবু তো ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য কতই পরিকল্পনা ছিল, কিছুই প্রায় সফল হয় নাই, উপযুক্ত অর্থের অভাবে অনেক উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করিতে হইয়াছে।

হায় ! ছেলেমেয়েরা চিত্রলেখার সে আত্মত্যাগের ধর্ম্ম কোনোদিন বুঝিল না। কাহাদের জন্য চিত্রলেখার এই সংগ্রাম, এই সাধনা ? কি নিরুপায় অবস্থার মাঝখানে ভাসাইয়া দিয়া স্বামী চলিয়া গেলেন, এক দিনের জন্য কি সে অবস্থার আঁচ তাহাদের গায়ে লাগিতে দিয়াছে চিত্রলেখা ?

একা অসহায়া নারী সমস্ত দায়িত্ব বহন করিয়া লগি ঠেলিতে ঠেলিতে মাঝ-দরিয়া হইতে তীরের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে আজ।

কিন্তু বেচারা চিত্রলেখার ভাগ্যে 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর !'

ছেলেমেয়েরা এমন ভাব দেখায় যেন চিত্রলেখা আজীবন তাহাদের অনিষ্ট করিয়াই আসিতেছে। যেন সেই বুড়ী ঠাকুরমার কাছ হইতে গোবর-গঙ্গাজলের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া জীবন কাটাইতে পারিলেই তাহাদের ছিল ভালো।

কী নিষ্ফল জীবন চিত্রলেখার !

তবু তো কই ওদের হিতচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। বেবির কাছ হইতে শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা খাইয়াও বেবির জন্যই অসাধ্য সাধনের সাধনা করিয়া মরিতেছে।

তাহাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত না দেখা পর্য্যন্ত মরিয়াও যে শান্তি হইবে না চিত্রলেখার।

এই যে আজকের ব্যাপারটা, এর জন্য কত কাঠখড় পোড়াইতে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে—কে তাহার হিসাব রাখে ? এর জন্য কতদিন কতদিকে যে কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইবে ! ইচ্ছামত অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্যও যদি থাকিত আজ !

মণীন্দ্রর জন্য মন কেমন না করিয়া হিংসাই হয়।

যেন সব কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা চিত্রলেখার ঘাড়ে চাপাইয়া টেক্কা মারিয়া চলিয়া গিয়াছেন মণীন্দ্র।

আজকের ব্যাপারে চিত্রলেখার পরিশ্রমের চাইতে উদ্বেগটাই ছিল প্রবল, যে মেয়ে শেষ পর্যন্ত সহজ থাকিলে হয় ! নিজের সন্তানকে চিনিতে পারা যায়

না, এর চাইতে দুর্দ্দান্ত পরিহাস আর কি আছে জগতে!

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বিরাট কিছু নয়।

নিতান্ত বন্ধুগোষ্ঠী কয়েকজন, যাঁহাদের কাছে সব কিছু না দেখাইয়া তৃপ্তি নাই। আর চিত্রলেখার সেজকাকীমার পরিবার। অনেক ভাগ্যে এ সময়টা এখন কলিকাতায় রহিয়াছেন তাঁহারা। দেখিবার এবং দেখাইবার এমন সুযোগ ক'বার আসে?

কিরীটীর মত জামাই সংগ্রহ করা যে সেজকাকীর স্বপ্নেরও বাহিরে, এ কি আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে? তাঁহার মেয়ের তো সেই রূপ! 'কালো হাতী' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তার উপর আবার নাকি বার দুই আই. এ. ফেল করিয়া নামকাটা সেপাই হইয়া বসিয়া আছে।

কন্যার সৌন্দর্য্য-গর্ব্বে নূতন করিয়া যেন বুকটা দশহাত হইয়া ওঠে।

তাছাড়া—বিদ্যা?

টকাটক করিয়া এম. এ. পর্য্যন্ত পাস করিয়া ফেলিল, হোঁচট খাইল না, ধাক্কা খাইল না—শুধু একটি জিনিসের নিতান্তই অভাব, যে অভাবটা চিত্রলেখার মনে একটা গহ্বর রাখিয়া দিয়াছে।

মডার্ণ কালচারের অভাব।

বেশভূষার পারিপাট্য যে নাই মেয়ের তা নয়, তবু কেমন যেন সামঞ্জস্যহীন, অসম্পূর্ণ! হয়তো দশদিন খুব বাড়াবাড়ি করিল, আবার দশদিন যেমন তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিল। সেই মূর্ত্তি লইয়া বাহিরের লোকের সামনে বাহির হইতেও আপত্তি নাই। এ আর শোধরানো গেল না। তা ছাড়া নাচ-গানের দিকেও আজকাল আর যাইতে চাহে না, অকৃত্রিম সাধারণ গলায় কথা বলে, কথাবার্ত্তা কোন কিছুরই কায়দা জানে না।

অথচ সেজকাকীমার মেয়ে লিলি, সেই পাটের গাঁটের মত দেহটা লইয়া কি নাচ নাচিয়াই বেড়ায়!...কথায়-বার্ত্তায় চাল-চলনে একেবারে কায়দা-দুরস্ত।

পাঁচটা বাজিতেই লিলি আসিয়া হাজির হইল।

মা আসিতে পারিবেন না, তাই একাই আসিয়াছে সে। চিত্রলেখার রোষক্ষুব্ধ প্রশ্নের উত্তরে মিহি মিহি আদুরে গলায় বলে—কি করবো বলুন বড়দি,

মার যে ভীষণ মাথা ধরে উঠল, আমারই আসা সম্ভব হচ্ছিল না, নেহাৎ আপনি দুঃখিত হবেন বলেই—

—অসীম দয়া তোমার এবং তোমার মার—কিন্তু সেজকাকা ?

—বাবার তো কদিন থেকেই প্রেসার বেড়েছে।

—ওঃ! টম্ জিম ?

—তাদের যে আজ ম্যাচ রয়েছে।

—শুনে খুশী হলাম। এরকম মণিকাঞ্চন-যোগ হওয়াটা একটু আশ্চর্য্য এই যা!

ভারী মুখে সরিয়া যায় চিত্রলেখা অন্য অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করিতে। যা করিবে সবই তো একা। আজ বেবি বিয়ের কনে, তাকে কিছু আর এ ভার দেওয়া চলে না।…আর কিছুই নয়, এটি সেজকাকীমার ঈর্ষার ফল। দেখিলে বুক ফাটিয়া যাইবে তো!

লিলি ছুটিয়া আসিয়া বলে—এই বেবি, তোর বর কখন আসবে তাই বল্। সত্যি বলতে, ওই জন্যই এলাম আরো!

তাপসী হাসিয়া বলে—ও কি? বরং বলো 'জামাতা বাবাজী'! মাসী হও না তুমি আমার?

—ছেড়ে দে ওকথা। সত্যি বল্ না রে?

—কি করে জানবো? এলেই দেখতে পাবে।

—ইস্, উনি জানেন না আবার! বলবি না তাই বল।…এই শাড়ীখানা কত দিয়ে কিনলি রে? ফাইন শাড়ীখানা!

তাপসী হাসিয়া বলে—আমি কোথায় কিনলাম, মা তো! মায়েরই পছন্দ।

—মা! মাই গড! এখনো তোর শাড়ী-ব্লাউজ বড়দি পছন্দ করে দেন? আছিস কোথায়? বরটিকে পছন্দ করার ভারটা নিজের ভাগে রেখেছিস কিছু, না সেও মা যা করবেন!

—নিশ্চয় তো। আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাইনে!

—ইস্! ইনোসেণ্ট গার্ল একেবারে! তবু যদি না সেদিন বড়দির মুখে শুনতাম—, রুমাল মুখে চাপিয়া 'খুক খুক' করিয়া হাসিতে থাকে লিলি।

তাপসী সহসা গম্ভীর হইয়া বলে—কি শুনলে?

—এই—সে বেচারা প্রেমে সাঁতার-পাথার খাচ্ছে একেবারে, আর তুমি—

হঠাৎ যেন চকিতে শিহরিয়া ওঠে তাপসী—এই এই, রুমালে লেগে যায় নি তো?

হতচকিত লিলি বলে—লেগে যাবে? কি লেগে যাবে?

—রং! তোমার কোটিংটা বোধ হয় কাঁচা রয়েছে এখনো!

কথাটা মিথ্যা নয়, লিলিকে দেখিলে একটি সন্ত রং-করা কাঁচামাটির পুতুল বলিয়াই মনে হয়।

লিলি পরিহাসপ্রিয় বটে, কিন্তু নিজে পরিহাস করা এক, আর অপরের পরিহাস পরিপাক করা আর। তাই মুখ ফুলাইয়া উত্তর দেয়—কি করবো বলো, তোমার মতন খাঁটি পাকা রং নিয়ে তো জন্মাই নি ভাই, আমাদের কাঁচা রং মাখা ভিন্ন উপায় কি?

তাপসী তাড়াতাড়ি বলে—আচ্ছা রোসো, কাঁচা-পাকার তর্ক এসে করবো, একবার নীচের তলা থেকে ঘুরে আসি। মা একটা কাজ বলেছিলেন, দারুণ ভুলে গেছি।

মাসীর হাত এড়াইবার এই সহজ কৌশলটা আবিষ্কার করিয়া বাঁচিয়া যায় যেন।

এই ধরনের পচা পুরনো সস্তা রসিকতাগুলো সহ্য করা যে তাপসীর পক্ষে কত বিরক্তিকর, সে কথা কে বুঝিবে? নিতান্তই নাকি পরিহাসের উত্তরে হাস্য-পরিহাস না করিলে অভদ্রতা হয়, তাই নিজেও তাহাতে যোগ দেওয়া। যাহা বলিতে হইয়াছে, তাহার জন্যই যেন তিক্ত হইয়া ওঠে মনটা।

দূর ছাই, এদের কবলমুক্ত হইয়া কোথাও সরিয়া পড়াই ভালো। বাগানের মধ্যে প্রিয় পরিচিত সেই জায়গাটিতে বরং বসা যাক খানিক—একদা মণীন্দ্র যে জায়গাটিতে একটা সিমেন্টের বেদী গাঁথাইয়া রাখিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে আসিয়া বসিবার জন্য।

জায়গাটা তাপসীর একান্ত প্রিয়। আসিয়া বসিলেই যেন বাবার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

তাপসী চলিয়া গেলে লিলি রাগে ফুলিতে থাকে।

বাস্তবিক, কাঁচা রং-এর উল্লেখে কোন্ মেয়েই বা অপমানের জ্বালায় ছট্ফট না করে।

সত্যি বলিতে কি, তাপসীর উপর একটা আকর্ষণ অনুভব করিলেও, ওই কে

ওর কেমন একটা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় আভিজাত্যের ভাব আছে, ওইটাই লিলির হাড়পিত্ত জ্বালাইয়া দেয়।

আর কিছু নয়, রূপের গরব!

তেমনি একচোখো ভগবান! রূপ দিয়াছো, দিয়াছো, স্বাস্থ্যটাও কি এমন অনবদ্য দিতে হয় যে, রোগা হইতে জানে না, মোটা হইয়া পড়ে না! বরাবর এক রকম! যেন একটি নিটোল পাকা ফল!

রসের প্রাচুর্য্য আছে—আধিক্য নাই। শাঁস আছে—ভার নাই।

আর লিলি? লিলির বিধাতা শৈশবাবধি এত শাঁসালো আর রসালো করিয়া গড়িয়াছেন লিলিকে যে আধুনিক হইবার সমস্ত উপকরণই যেন তাহার দেহে উপহাস হইয়া দাঁড়ায়।

অতএব সুমধ্যমা তন্বী রূপসীদের উপর যদি সে হাড়ে-চটা হয় তো দোষ দেওয়া যায় না। তাহার উপর আবার যদি সে রূপসী একটি কন্দর্পকান্তি বর যোগাড় করিয়া ফেলে!

হায়, শুধু কি লিলিই জ্বলিতে থাকে? তাপসীর ভিতর কি দুর্দ্দমনীয় জ্বালা, সে কথা বুঝিবার সাধ্য লিলির আছে?

নিজেকে সমস্ত কোলাহল আর সমারোহের মাঝখান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া বাগানের একপ্রান্তে গিয়া নিজেকে যেন ছাড়িয়া দেয় তাপসী।

হে ঈশ্বর, এ কি করিতে ব'সয়াছে সে?

অমিতাভর উপর প্রতিশোধ লইতে গিয়া নিজেকে কোন্ অধঃপাতের পথে ঠেলিয়া দিবার আয়োজন শুরু করিয়াছে?

অধঃপাত ছাড়া আর কি বলা যায়?

আর ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে এতগুলো লোককে সাক্ষী রাখিয়া কিরীটীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন পাকা করিয়া ফেলিবার দলিলে সই করিতে হইবে তাহাকে!

আত্মহত্যা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন উপায় থাকিবে না তার।

বাবা! বাবা! তুমি কেন তোমার আদরের বেবির জীবনের এই জটিল জটটা না ছাড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলে? নিঃসঙ্গ তাপসীর আশ্রয় কোথায়? কে তাহাকে সত্যকার উচিত-অনুচিত শিক্ষা দিবে?

যখন নিজের হৃদয়ের সঙ্গে আপস ছিল, তখন তবু সহজ ছিল। সহজ ছিল চিত্রলেখার অসঙ্গত ইচ্ছাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া। আজ যে বন্ধ বাধিয়াছে

আপন হৃদয়ে, একে উড়াইয়া দেওয়া আর সহজ কই !

অমিতাভ ছেলেমানুষ হইলেও উচিত কথাই বলিয়া ছিল।

সত্যই তো, কি প্রয়োজন ছিল কিরীটীকে এত প্রশ্রয় দিবার ?

দিনের পর দিন কিসের আসা দিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া আসিয়াছে তাপসী ? নিজের মনের নিজের অজানিত চাপা লোভের বশেই নয় কি ?

সেই লোভই ভদ্রতাব ছদ্মবেশে পদে পদে প্রসারিত করিয়াছে তাপসীকে। কিরীটীকে প্রত্যাখ্যান করিবাব মত সাহস যোগাইতে দেয় নাই।

বিদ্রোহেব একটা ভান করিয়া আসিয়াছে বটে এবাবর, কিন্তু আত্মসমর্পণে উন্মুক্ত চিত্ত লইয়া বিদ্রোহের অভিনয় করাব কি সত্যই কোনো মানে আছে ? হয়তো বা—হয়তো বা এতদিন যে বিকাইয়া যায় নাই, সে শুধু কিরীটীর ভীরুতার জন্যই—দস্যুর মত লুণ্ঠন করিয়া লইবার শক্তি কিরীটীব নাই, প্রার্থীর মত অপেক্ষা করে।

অসতর্ক কোনো মুহূর্তে ওব এই নিশ্চেষ্ট সম্ভ্রমের ভঙ্গী কি অসহিষ্ণু করিয়া তুলে নাই তাপসীকে ?

যদি কিরীটীর দিক হইতে সাহসের প্রাবল্য থাকিত, তাপসী কি খুঁটি আঁকড়াইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিত ? কে জানে ! কোনোদিন তো এমন স্পষ্ট করিয়া মনকে প্রশ্ন করিয়া দেখে নাই। সভয়ে পাশ কাটাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে করিতে হঠাৎ এক সময়ে যেন কঠিন হইয়া ওঠে তাপসী। প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোলে নিজেকেই।

কেন ? কেনই বা সে চিরকাল এমন বঞ্চিত হইয়া থাকিবে ? পাপের ভয়ে ? না সেই খেলাঘরের বরের আশায় ?

দুটোই সমান অর্থহীন।

যে কাজের জন্য সে নিজে এক বিন্দু দায়ী নয়, তাহাব পাপ-পুণ্যের ফল ভুগিয়া মরিবার দায় কেন তাহার ? ··বোকামি ? স্রেফ বোকামি ! আশাহীন আনন্দহীন প্রেমস্পর্শহীন নিরর্থক জীবনটা—জনশূন্য ঘরে নিরর্থক জলিয়া যাওয়া মোমবাতির মত কেবলমাত্র জলিয়া জলিয়া নিঃশেষ হইতে থাকিবে ?

প্রতিনিয়ত নিজেকে চাবুক মারিয়া মারিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখাই কি নারীধর্ম্ম ? চাবুক শুধু নিজেকে মারা নয়—আরো একখানি আগ্রহোন্মুখ প্রসাদ-ভিক্ষু হৃদয়কেও যে চাবুক মারিয়া ফিরাইতে হইতেছে।······বুলু বুলু ! কোথায় সেই

অপরিণত বয়স্ক বালক? সে কি আজও বাঁচিয়া আছে? স্বামীত্বের দাবী লইয়া কোনো দিন কি উপস্থিত হইবে তাপসীর কাছে? স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে কি?

তাপসী কি তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে?

কিন্তু তাপসীর সহায় কে?

মা প্রতিকূল, অভী নিতান্তই বিমুখ। বাবলু তো বালক মাত্র। তবে কে? নানি? নানিই তো তাহার জীবনের শনি।...নয়তো কি। মনে মনে সেই শনিকে উদ্দেশ করিয়াই প্রশ্নে জর্জ্জর করিতে থাকে তাপসী।.. কেন? কেন? অমন উদাসীন নিশ্চিন্ততায় কাশীবাস করিবারই বা প্রয়োজন কি ছিল তোমার? যে জট পাকাইয়া রাখিয়াছো, তাহার গ্রন্থি খুলিবার দায়িত্ব কি কিছুই নাই তোমার? একবার কি কুসুমপুরে যাওয়া যায় না? কাশীর মায়া কাটাইয়া দেশে আসিয়া একবার খোঁজখবর লওয়া উচিত ছিল না কি? তাপসীর ইহকাল পরকাল খাইয়া চিত্রলেখার উপর অভিমান করিয়া দিব্য আরামে বসিয়া আছো, বিকার মাত্র নাই!

... নানির সঙ্গে একবার নিজেই যদি দেশে যাইতে পাইত তাপসী! খুঁজিয়া দেখিত—দেবমন্দিরের সেই উদার প্রাঙ্গণে সেই স্থলকমলের মত আরক্তিম দুখানি পায়ের ছাপ আজও আছে কিনা?

ধ্যেৎ! এ কি পাগলের মত ভাবনা শুরু করিয়া দিয়াছে তাপসী! বাঁচিয়াই যদি থাকে, সেই অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক এখনো গৃহিণীশূন্য গৃহে নীরস জীবন যাপন করিতেছে নাকি? পাগল! তাও আবার পাড়াগাঁয়ের ছেলে! কলিকাতার হোস্টেলে থাকিয়া পড়ালেখা করিবার কথা ছিল বলিয়াই যে করিয়াছে—তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? অল্প বয়সে অনেক পয়সা হাতে পড়ায় কুসঙ্গে পড়িয়া বিগড়াইয়া বসিয়া আছে কিনা কে বলিতে পারে?

সকলের উপর কথা—বাঁচিয়া আছে কিনা!

বাঁচিয়া থাকিলে—নিজেই কি এতদিনে একটা সন্ধান লইতে পারিত না? কিন্তু প্রয়োজনই বা কি তাহার? প্রয়োজন থাকিলে হয়তো লইত। অবশ্য প্রথম দিকে এখানের ব্যবহারটা ভদ্রজনোচিত হয় নাই, তবু শিক্ষা-দীক্ষা—যদি সব কিছু পাইয়া থাকে—সভ্যতা-ভব্যতার একটা মূল্য আছে তো? বিবাহিতা পত্নীর পত্নীত্বকে উড়াইয়া দিয়া—

বিবাহিতা?

আচ্ছা, বিবাহটা কি সত্যই শাস্ত্রসম্মত হইয়াছিল? 'বিবাহ' বলিয়া গণ্য করা যায় তাহাকে?

বহুদিন বহুবার সেই কথাটাই ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে তাপসী, আজকে খোলা চোখে স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে বসে।

হয়তো যে বাধাটাকে সে দুর্লঙ্ঘ্য মনে করিয়া এতদিন বিরাট একটা মূল্য দিয়া আসিতেছে, আসলে সেটা কিছুই নয়, বিরাট একটা ফাঁকি মাত্র! শখের যাত্রাদলের রাজরাণী সাজিয়া অভিনয় করার মত। সে অভিনয়ের অন্যতম অভিনেতা কোন্ কালে সেই অভিনয়-সজ্জা খুলিয়া স্বাভাবিক জীবনযাপন করিতেছে।

সেই খামখেয়ালী খেলার অভিনয়ের রাণীত্ব লইয়া, ভিখারিণীর মত নিজেই তাহার দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইবে তাপসী? বলিবে—'এই দেখ আমি তোমার জন্য দীর্ঘকাল শবরীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ আসিয়াছি তোমার চরণে শরণ লইয়া ধন্য হইতে!'

চিনিতে না পারিয়া সে যদি হাসিয়া ওঠে?

যদি পূর্ব্ব অপমানের শোধ লইতে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়? নিজের সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার মাঝখানে আকস্মিক উপদ্রব ভাবিয়া অবজ্ঞা করে?

তবু যাইবে নাকি তাপসী?

যাইবে সতীনের ঘরে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিতে?

ছি ছি!

চিত্রলেখাই বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন সংসার-অভিজ্ঞ মানুষ। তাই উড়াইয়া দিবার বস্তুকে চিরদিন উড়াইয়া দিয়াই আসিতেছে। ঘরে বাহিরে কোথাও কোনোদিন সে কথাটুকু উচ্চারিত মাত্র হইতে দেয় নাই।

তাপসী মিথ্যা স্বপ্নের মোহে, মিথ্যা সংস্কারের দাসত্বে আজীবন নিজেও কষ্ট পাইল, মাকেও কম কষ্ট দিল না। চিত্রলেখার এই যে কাঙালপনা, এই যে রোষ ক্ষোভ অসহিষ্ণুতা, সব কিছুর মূল কারণই তো তাপসীর ভবিষ্যৎ সুখের আশা!

হয়তো চিত্রলেখার ধারণাটা ভুল, কিন্তু সন্তানের সুখ-চিন্তায় তো ভুল নাই। তবে তাপসী সেই মাতৃহৃদয়কে অবহেলা করিবে কোন্ শ্রেয় বস্তুর আশায়?

আর—আর শুধুই কি মাতৃহৃদয়?

আর একখানি উন্মুখ হৃদয়কে চাবুক মারিয়া মারিয়া দূরে সরাইয়া দিবার

কঠোর যন্ত্রণা নিজের হৃদয়কেও কি অহরহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছে না?

যাক্। আর নয়। ঘটনার প্রবাহে নিজেকে এবার ছাড়িয়া দিবে সে।

দেখা যাক্ বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বজ্র ভাঙিয়া আসিয়া তাপসীর মাথায় পড়ে কিনা।

স্থানভ্রষ্ট চুলের গোছা ও শাড়ীর আঁচল গুছাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তাপসী।

ছাড়িয়া দিবে নিজেকে—আলোর বন্যায়, উৎসবের কলস্রোতে। ছাড়িয়া দিবে নিজেকে মায়ের হাতে। ছাড়াইয়া লইবে নিজেকে বহুদিন-বর্দ্ধিত সংস্কারের কঠিন শিলাতল হইতে।

নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিবে আপনাকে প্রেমাস্পদের উন্মুক্ত বক্ষে, বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনের মধ্যে।

সেই ভালো।

তাই হোক। সেইটাই স্বাভাবিক। আজীবন বালবিধবার উদাস-ভঙ্গী আর নিস্পৃহ মন লইয়া এই শোভাসম্পদময়ী ধরণীতে টিকিয়া থাকার কোনো অর্থই হয় না!

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের নিশ্চিন্ত মনোভাব লইয়াই যেন এবার সে উৎসব সমারোহের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করিতে যায়। হাস্য-লাস্যময়ী তাপসীকে দেখিয়া অবাক হোক কিরীটী, মুগ্ধ হোক, ধন্য হইয়া যাক।

চোখ জুড়াক চিত্রলেখার। জ্বলিয়া মরুক লিলি।

অমিতাভ বুঝুক তার পছন্দ-অপছন্দকে কেয়ারও করে না তাপসী। তার প্রিয় ব্যক্তিকে অপমান করিয়া বিতাড়িত করার সাধ্য কাহারও নাই—প্রেমের মর্য্যাদায় তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে তাপসী।

চটিটা পায়ে গলাইতেছে—পিছন হইতে ডাক পড়িল।

না, চিত্রলেখার নয়, লিলির নয়, বন্ধু-বান্ধবী কাহারও নয়, নিতান্তই প্রিয় ব্যক্তিটির। যাহার চিন্তায় তাপসীর এত সুখ, এত যন্ত্রণা! যে তাপসীর দিন-রাত্রির শান্তি অপহরণ করিয়া লইয়াও তাপসীর প্রিয়তম!

যে আসিয়াছিল—পিছন হইতে কাঁধের উপর আলগোছে একটু স্পর্শ দিয়া আবেগ-মধুর কণ্ঠে ডাকিল—"তাপসী!"

তাপসী! কিরীটীর এত বড় সাহস বাড়িল কখন?

তাপসীর সিদ্ধান্ত জানিয়া ফেলিল নাকি মনে মনে? অথবা চিত্রলেখার

সস্নেহ প্রশ্রয়ের জের? তাপসীর কাঁধে হাত রাখিবার মত দুঃসাহস তো গত সন্ধ্যাতেও ছিল না তাহার!

কম্পিত তাপসী ঘুরিয়া দাঁড়ায়। সহজ হইবার চেষ্টায় আরো ভাঙা গলায় বলে—আপনি কখন এলেন?

— এই তো আসছি। গেটটা পার হতেই চোখে পড়লো এই নির্জ্জন কোণে তোমার ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি।······আজকের তুমি, আমার নিজস্ব আবিষ্কার তাপসী।

হায় হায়! নিজেকে যে এতক্ষণ ধরিয়া প্রস্তুত করিল তাপসী, কোথায় গেল সে সব? কোথায় সেই হাস্যেলাস্যে চপলতায় কিরীটীকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবার মত নূতন রূপ! আগের মতই অস্বচ্ছন্দ ভাবে বলে—চলুন বাড়ীর ভেতরে যাই।

—না না, থাক্, কিরীটী ব্যগ্রস্বরে বলে—বাড়ী তো আছেই, থাকবেও—কতকগুলো ঝঞ্ঝাট, গোলমাল, আর চোখ-জ্বালা আলো নিয়ে।·· এমন পরিবেশের মধ্যে তোমাকে পাওয়া দুর্লভ নয় কি?···বোসো লক্ষীটি!

সন্ধ্যার আভাসে আকাশে পড়িয়াছে ছায়া, মাটির বুকে গোধূলির সোনার ঢেউটা ম্লান হইয়া আসিতেছে···বাগানের এই নিভৃত কোণটিতে তো আরো তাড়াতাড়ি ঘনাইয়া আসিবে অন্ধকার······এখানে একা একা কিরীটীর সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া থাকিবে তাপসী?

আশ্চর্য্য প্রস্তাব তো!

নাঃ, সমর্পণের মন্ত্র বৃথাই এতক্ষণ অভ্যাস করিয়াছে সে। অসঙ্কোচে পাশে আসিয়া বসিতে পারিতেছে কই? বসিতে পারে না, প্রতিবাদও করে না, অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

হয়তো এই অসতর্ক মুহূর্ত্তে—যদি কিরীটীর বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনীর ভিতর ধরা পড়িতে হইত তাপসীকে—সমস্ত সহজ হইয়া যাইত, মোড় ফিরিয়া যাইত তাপসীর বাকি জীবনের, কিন্তু তাহা হইল না। অত সাহস কিরীটীর নাই।

এমনিই হয় মানুষের জীবনে। প্রতিনিয়ত এমনি কত সম্ভাবনাময় মুহূর্ত্ত বৃথা নষ্ট হয়—সমস্যা মীমাংসার প্রান্তসীমায় আসিয়া ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া যায় জটিলতার পথে—হৃদয়াবেগের সহজ প্রকাশ আচ্ছন্ন করিয়া তোলে অকারণ কুণ্ঠার কুয়াশা।

দস্যুর মত লুঠ করিয়া লইবার সাহস সকলের থাকে না।

কিরীটী তাপসীর মতই ভীরু, কুণ্ঠিত, লাজুক। তাই কাঁধের উপরকার আলগোছ স্পর্শটুকুও সরাইয়া লইয়া শুধু কণ্ঠস্বরে সমস্ত আগ্রহ ভরিয়া বলে—তাপসী শোনো—পালিয়ে যেও না। আজ আমাকে কিছু বলতে দাও। যে কথা বলতে না পেরে আমার দিনরাত্রি শান্তিহীন, যে কথা বলবার জন্যে আমার সমস্ত হৃদয় অস্থির হয়ে থাকে, সাহসের অভাবে যা কোনোদিনই বলতে পারি নি, আজকের এই পরম মুহূর্ত্তে বলতে দাও সেই কথাটি।

'বলতে দাও!' বলিতে দিবার প্রয়োজন আছে নাকি?

তাপসী কি জানে না সেই কথাটি?

সৃষ্টির আদিকাল হইতে নারীর উদ্দেশে যে কথা ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে পুরুষের বিহ্বল কণ্ঠে, সেই কথাটিই আর একবার ধ্বনিত হইবে নূতন ছন্দে, নূতন মহিমায়। কিন্তু নারীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয় না বলিয়াই কি তাহার কথা অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়? নারীর শিরায় শিরায় রক্তের উন্মাদ দোলায় ধ্বনিত হয় না সেই চিরন্তন বাণী? তার নির্ব্বাক ভঙ্গিমায় উচ্চারিত হইতে থাকে না প্রেম-নিবেদনের বিহ্বল ভাষা? উচ্চারণ করিবার প্রয়োজনই বা তবে কোথায়? স্বেদাক্ত কোমল দুখানি করতল বলিষ্ঠ তপ্ত দুই মুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া শুধু পাশাপাশি বসিয়া থাকাই তো যথেষ্ট। বিশেষণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কথা সাজাইবার দুরূহ পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়।

কিন্তু পরিশ্রম বাঁচাইবার কৌশল সকলে জানিলে তো।

তাপসী এক নিমেষ চোখ তুলিয়া তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে যা বলে—শুনিতে পাওয়া গেলে বোধ করি তার অর্থ এই দাঁড়াইত—ওদিকে হয়তো সকলে তাপসীর অনুপস্থিতিতে ব্যস্ত হইতেছে, খুঁজিতে আসিবে এখুনি, অতএব—

—খুঁজুক না, ক্ষতি কি? এই মুহূর্ত্তটি নষ্ট হয়ে গেলে হয়তো আমিও খুঁজে পাবো না আমার সাহসকে!

—এত ভয় কিসের?

—ভয়? ঠিক ভয় নয়, তবে ভরসার অভাব বলতে পারো। প্রতিদিন প্রস্তুত হয়ে আসি বলবো বলে, কিন্তু ফিরে যাই। তবে আজ নিতান্ত প্রতিজ্ঞা করেই এসেছি…ওকি! তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

—না, কিচ্ছু না। কিন্তু আমি বলি কি—এতদিন যদি না বলেই কেটেছে, তবে আজও থাক।

—কিন্তু কেন? মেনে নাও না নাও—শুনতে তো তোমার ক্ষতি নেই

তাপসী!

—ক্ষতি? হঠাৎ তাপসী কেমন অদ্ভুত ভাবে হাসিয়া ওঠে—আমার ক্ষতি করার ভারটা স্বয়ং বিধাতাপুরুষ নিজের ঘাড়েই নিয়ে রেখেছেন—মানুষের জন্যে আর বাকি রাখেন নি কিছু। তবু থাক্।

—তবে থাক্, হয়তো আজও সময় হয় নি। কিন্তু শুনতে পারলে বোধ হয় ভালোই হতো। কিংবা কি জানি, শোনাতে গেলে এটুকু সৌভাগ্যও আমার বজায় থাকবে কিনা! আচ্ছা থাক্, আজকের গোলমালটা কেটেই যাক, চলো ভেতরে চলো।

—যাচ্ছি, আপনি যান।

এদিকে সত্যই তখন তাপসীকে ডাকাডাকি পড়িয়া গিয়াছে। অতিথি অভ্যাগত সকলেই যে তাপসীকে দেখিতে উৎসুক। চিত্রলেখা কিরীটীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই সহর্ষে বলিয়া ওঠে—এই যে এসে গেছো তুমি! বেবির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ, ওই যে বাগানের ওদিকটায় দেখলাম যে—

চিত্রলেখা মনে মনে হাসিয়া ভাবে—আহা মরে যাই, 'ইনোসেন্ট' একবারে! নিভৃতে দেখা করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পূর্ব্বাহ্নেই বাগানে গিয়া বসিয়া আছেন মেয়ে, এটুকু যেন চিত্রলেখা ধরিতে পারিবে না! দেখ দেখি—একটা অর্থহীন কুসংস্কারকে সার সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই আগ্রহ-ব্যাকুল হৃদয়কে দাবাইয়া রাখিয়া কী বৃথা কষ্টই পাইয়াছ এতদিন! যাক্, শেষ অবধি যে সুমতি হইল এই ঢের।

স্নেহমধুর কণ্ঠে গদ্‌গদ ভঙ্গী আনিয়া চিত্রলেখা কিরীটীকে অনুযোগ করে—দেখে চলে এলে যে বড়! ডেকে আনতে হয় না?

—এখুনি আসবেন বোধ হয়।

—বোধ হয়? বাঃ, বেশ ছেলে তো বাপু! আজকের দিনে সে বেচারাকে 'বোধ হয়'-এর উপর ছেড়ে দিয়ে চলে আসা কিন্তু উচিত হয় নি তোমার! এদিকে সকলে ওর জন্যে ব্যস্ত হচ্ছে। খাওয়ার আগে গান গাইবার, আর খাওয়ার পর গীটার বাজিয়ে শোনাবার প্রোগ্রাম রয়েছে—এদিকে মেয়ে নিরুদ্দেশ! বদ্ধ পাগল একটা! এবার থেকে বাপু আমি নিশ্চিন্ত, ওর পাগলামি সারাবার ভার তোমার।

কিরীটী মনে মনে হাসিয়া ভাবে—পাগলামি সামলানোর ভার যে নেবে, সে বেচারাই যে পাগল হতে বসেছে।

অতঃপর চিত্রলেখা আমন্ত্রিতা মহিলাদের সঙ্গে কিরীটীর পরিচয় করাইয়া দিয়া প্রত্যক্ষে তাপসীর অসীম সৌভাগ্যের জন্য প্রশংসা এবং পরোক্ষে ঈর্ষা অর্জ্জন করিতে থাকে। নিজেও বড় কম আত্মপ্রসাদ অনুভব করে না। রূপে-গুণে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, অর্থে-স্বাস্থ্যে এমন অতুলনীয় জামাতা-রত্ন সংগ্রহ করা কি সোজা ব্যাপার! এই যে এতগুলি ভদ্রমহিলা সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন, ইঁহাদের মধ্যে কয়জন এমন রত্নের অধিকারিণী? অথবা অধিকারিণী হইবার আশা রাখেন? তাহাব নিজের মেয়েটিও অবশ্য দুর্ল্লভ রত্ন, তবু চিত্রলেখার 'ক্যাপাসিটি'ও কম নয়।...কত কষ্টে কত চেষ্টায়, কত যত্নে যে এই পরিস্থিতিটির সৃষ্টি করিতে হইয়াছে সে চিত্রলেখাই জানে।

পরিচয়-পর্ব্ব শেষ হইলে চিত্রলেখা আর একবার স্নেহগদ্‌গদ কণ্ঠে বলে—নাঃ, বেবিটা দেখছি পাগল হয়ে গেছে! কি অদ্ভুত ছেলেমানুষ দেখেছো? তুমিই একবার যাও বাপু ডেকে আনো গে। এত লাজুক মেয়ে—উঃ!

মেয়ের লজ্জার বহ ব নিজেই যেন হাঁফাইতে থাকে চিত্রলেখা।

তবে বেশীক্ষণ আর এই কৃত্রিম হাঁফানির প্রয়োজন হয না, হাঁকাহাঁকি ছুটাছুটি করিবার উপযুক্ত একটা কারণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে তাপসী।

ডাকিতে গিয়ে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহাকে। বাগানে নয়, ঘরে নয়, সারা বাড়ীর কোথাও নয়। বাড়ীর খোঁজার পালা শেষ করিয়া বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকের বাড়ী এবং ক্লাব লাইব্রেরী সর্ব্বত্র তোলপাড় করিয়া ফেলা হয়—দু'দশখানা মোটর লইয়া। একা চিত্রলেখাই নয়, গৃহস্থ আর নিমন্ত্রিত প্রত্যেকেরই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকির আর অন্ত থাকে না।

এমন অনাসৃষ্টি ব্যাপারের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না, কাজে-কাজেই ইচ্ছামত জল্পনাকল্পনা করিতেও ত্রুটি রাখে না কেহই। 'পাকা দেখা'র দিন বিয়ের কনে হারাইয়া গেলো, এমন মুখরোচক ব্যাপার কিছু আর সর্ব্বদা ঘটে না, অতএব অনেক মন্তব্যই যে রসালো হইয়া উঠিবে এ আর বিচিত্র কি!

বেচারী ভাবী জামাতা কনের এমন অপ্রত্যাশিত ভাব-বিপর্য্যয়ে বিমূঢ়ভাবে গাড়ীখানা লইয়া বারকয়েক এদিক ওদিক করিয়া একসময়ে কোন্ ফাঁকে নিঃশব্দে চলিয়া যায়।

কান্তি মুখুজ্জের প্রতিষ্ঠিত "রাইবল্লভে"র বিগ্রহ ও মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার শেষ পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মী দেবীর ঘাড়েই পড়িয়াছে। উপায় কি? আপনার বলিতে কে আর আছেই বা কান্তি মুখুজ্জের? অবশ্য মন্দির রক্ষার পাকা ব্যবস্থা হিসাবে—নিত্যসেবা ছাড়াও নিয়মসেবা, পালপার্ব্বণ ইত্যাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রের তিনশো তেষট্টি রকম অনুষ্ঠানের জন্য সব কিছুই ব্যবস্থা আছে। পূজারী হইতে শুরু করিয়া ফুলতুলসী-যোগানদার মালীটি পর্য্যন্ত। তবু সবই তো মাহিনা করা লোক, তাহাদের উপর তদারকি করিতে একজন বিনা মাহিনার লোক না থাকিলে সত্যকার সুশৃঙ্খলে চলে কই? তাই রাজলক্ষ্মী স্বেচ্ছায় এই ভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। আর না লইয়াই বা করিতেন কি? তাঁহারও তো জীবনের একটা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে?

বুলুবাবু তো দীর্ঘকাল সাগরের ওপারে চলিয়া আসিয়া এতদিনে কলিকাতায় কি যেন কাজে লাগিয়াছে। কিন্তু লাগিলেই বা কি? না বৌ, না ঘর-সংসার। বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়ার মত থাকে ফ্ল্যাটে, খায় হোটেলে, অবসর সময়ে হাওয়া-গাড়ীখানাকে বাহন করিয়া গায়ে হাওয়া লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার কাছে আর রাজলক্ষ্মী যাইবেনই বা কোন্ সুখে?

একেই তো কলিকাতার নামে গা জলিয়া যায় রাজলক্ষ্মীর। ওই নিজেই সে মাঝে মাঝে আসিয়া যে পিসিকে দেখা দিয়া যায় সেই ঢের।

কতকাল হইল মারা গিয়াছেন কান্তি মুখুজ্জে। তবু এখনো মামার কথা উঠিলে অনেক সময়েই রাগিয়া যা-তা বলিয়া বসেন রাজলক্ষ্মী। ভীমরতি ধরিয়াছিল মামার, তাই একমাত্র নাতিটা, সৃষ্টিধর—বংশধর, তাহাকে লইয়া পুতুল খেলিয়া গিয়াছেন। ছেলেও তেমনি জেদী একগুঁয়ে, তা নয়তো সেই 'বেয়াকার' বিবাহটাকে সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে! এতদিনে একটা বিবাহ করিলে দুইটা ছেলে-মেয়ে হইয়া ঘর আলো করিত। পাত্রীরই 'ক অভাব? আর বুলুর মত ছেলের? যে বৌ বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে তার নাই ঠিক, ইচ্ছা করিয়া যে সকল সম্পর্ক ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, সেই বৌয়ের আশায় চিরজীবনটা কাটাইয়া দিবার মতলব না কি, তাই বা কে জানে? অথচ আশাই বা কিসের? নিজেও তো মুখে আনে না, চেষ্টা করিয়া খোঁজ করা দূরে থাক।

বলিয়া বলিয়া এবং বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করিয়া যখন রাজলক্ষ্মী চুপ

করিয়াছেন, তখন হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে বুলু আসিয়া হাজির।

রাজলক্ষ্মী পূজার ঘরের সলিতা পাকাইতেছিলেন এবং উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতেছিলেন। মোটরের হর্ন শুনিতে পাওয়া গেল না! বুলু ভিন্ন আর কে মোটরে চড়িয়া আসিবে এই অজ পাড়াগাঁয়? ট্রেনে চড়িতে ভালোবাসে না সে, টানা মোটরেই আসে কলিকাতা হইতে।

অনুমান মিথ্যা নয়, বুলুই বটে।

—পিসিমা এলাম!

একমুখ হাসি লইয়া সাড়ম্বরে এক প্রণাম।

—এসো বাবা আমার সোনামণি। তবু ভালো যে বুড়ী পিসিকে মনে পড়লো।

—বাঃ, মনে পড়তো না বুঝি! আসা হয় না এই যা। আজ এলাম তোমাকে নেমন্তন্ন করতে।

—আমাকে নেমন্তন্ন? রাজলক্ষ্মী অবাক হইয়া তাকান।

—হ্যাঁ গো পিসিবুড়ী। বৌ বরণ করবে না?

রাজলক্ষ্মী কৌতূহল দমন করিয়া নিস্পৃহ স্বরে বলে—এত ভাগ্যি আর আমার হয়েছে! বৌ বরণ! হুঁ।

—'হুঁ' নয়গো পিসিমা, সত্যি। তোমার কষ্ট আর দেখতে পারছি না বাপু।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—আমার কষ্টের ভাবনায় তো ঘুম হচ্ছে না তোর। তা যাক্, ব্যাপারটা কি? সোন্দর মেয়ে-টেয়ে দেখেছিস বুঝি কোথাও? আহা, ভগবান সুমতি দিন।

—থামো পিসিমা, ভগবানের নাম আর কোরো না আমার সামনে। সেই ভদ্রলোকের দুর্মতির ফলে এই এত জ্বালা মানুষের, আবার তিনিই দেবেন সুমতি। তবেই হয়েছে! সত্যি কথা বললে তো বিশ্বাস করবে না তোমরা? বলছি তোমার কষ্ট দেখে একদিন প্রতিজ্ঞা করে বেরোলাম বৌ এনে দেবো তোমায়—তারপর এখন এই। বরণ করার খাটুনি তোমার।

—আহা, ওই খাটুনির ভয়েই হাতে পায়ে খিল ধরছে। কিন্তু মেয়ে কেমন তাই বল!

—আগে থেকে বলবো কেন? বাঃ, তুমি দেখে বুঝবে পরে।

—তা বেশ, ঘর-টর কেমন খবর নিয়েছিস? সেই তাদের মতন ছোটলোক চামার না হয়।

—চামার-কামার বুঝি না বাপু, তোমার কাছে ধরে এনে দেব, তার পর দেখো।

রাজলক্ষ্মী আবার হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—বাবাঃ, ছেলের মন হয়েছে তো, একেবারে মিলিটারী! আমি না হয় একেবারে দুধে-আলতার পাথরেই দেখলাম, কিন্তু ভট্‌চাযি্য মশাই, নায়েব মশাই—এঁদের তো একবার পাঠাতে হবে। পাত্রী আশীর্ব্বাদ করা চাই। তাছাড়া বিয়েব হাঙ্গামা কি সোজা? কথায় বলে, লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না। সেবারে এক কথায় বিয়ে দিয়ে মামা তো যা নয় তাই কবে গেছেন! আর আমি না দেখে, না শুনে বিয়ে দিচ্ছি না বাপু।

—তবেই হয়েছে! বুলু হতাশার ভান করিয়া বলে—তুমি আমার পাকা ঘুঁটিটি কাঁচাবে দেখছি। আচ্ছা বাপু, তোমার যা মন হয় সব কোরো, কিন্তু তার আগে যদি হঠাৎ বৌ এনে হাজির করি, তাড়িয়ে দেবে না তো?

রাজলক্ষ্মী রাগিয়া উঠিয়া বলেন—হ্যাঁ, তাই তো! আমি তোর পাকা ঘুঁটি কাঁচাবো, বৌ আনলে তাড়িয়ে দেবো—খুব বিশ্বাস রাখিস তো আমার ওপর! আমি বলে সাত দেবতার দোর ধবে, সিন্নি মেনে, হরির লুঠ মেনে বেড়াচ্ছি—কি করে তুই ঘরবাসী হবি! তাহলে নিশ্চয় এক বেটি মেম-ফেম বিয়ে করবি ঠিক করেছিস্, তাই অত ভয়!

—নির্ভয় হও পিসিমা, সে সব কিছু নয়। যেখানে যা মানত করেছ সব শোধ কোরো বসে বসে। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, তুমি বৌ দেখে অখুশী হবে না। আচ্ছা এবারে কোলকাতায় গিয়ে তোমাকে সব বিশদ খবর দিয়ে চিঠি দেবো, তারপর পাঠিয়ো তোমার নায়েব আর ভট্‌চায, পাইক আর পেয়াদা।

অতঃপর রাজলক্ষ্মী দেবী তোড়জোড় করিয়া বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া দেন। আব মনে মনে হাসেন। হুঃ বাবা, পিসির কষ্টের জন্যে তো বুক ফাটিতেছে তোমার! আরে বাবা, যতোই হোক বেটাছেলে, ভরা বয়েস, কত দিন আর বিধবা মেয়েমানুষের মত হেলায়ফেলায় জীবনটা কাটাইয়া দিবে! তবু যাই খুব ভালো ছেলে আমার বুলু, তাই অতদিন বিলেত ঘুরিয়া আসিয়াও গঙ্গাজলে ধোয়া মনটি। চাঁদের গায়ে কলঙ্ক আছে তো বুলুর গায়ে নেই। আর কিছু নয়—কলিকাতায় তো মেয়ে-পুরুষের মেশামেশি আছে, কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হইয়াছে নিশ্চয়!

এক যুগ আগের দেখা সেই ফুলের মত মুখখানি এক-আধবার মনে পড়িয়া-

মনটা একটু কেমন করিয়া ওঠে, কিন্তু জোর করিয়া রাগ আনিয়া সে স্মৃতিটুকু চাপা দেন রাজলক্ষ্মী। হুঁ:, সেই "গ্যাড-ম্যাড" মেয়ে এতদিনে একটা সাহেব-সুবোকে বিবাহ করিয়া বসিয়া আছে কিনা তাহার ঠিক কি? রুচি-ভক্তি থাকিলে আর এতকালেও একটা খোঁজ করে না!

বেশ করিবে বুলু—আবার বিবাহ করিবে।

জমিদারের বিবাহের উপযুক্ত সমারোহের আয়োজন করিতে থাকেন রাজলক্ষ্মী। দশ-বারোটা ঝিয়ের যোগাড় হয়—যাহারা রাতদিন থাকিয়া খাটিবে। বামুন-চাকরের অর্ডার হয় ডজন-দুই। বর্দ্ধমানে বায়না যায় নহবৎ বাজনার। গহনা-কাপড়ের ফ্যাশান বঝিতে সরকার মশাইয়ের কলিকাতা-ঘর করিতে জুতা ছেঁড়ে। এদিকে বস্তা বস্তা মুড়ি-চিঁড়া-মুড়কি তৈরির ধুম লাগে, মণখানেক ডালের বড়ি পড়ে, সুপারি কাটানো, সলিতা পাকানো—প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কাজের সীমাসংখ্যা নাই। গ্রামসুদ্ধ নিমন্ত্রণ হইবে নিঃসন্দেহ, সন্দেশের 'ছাঁদা' দিবেন সরায় করিয়া—না হাঁড়ি ভর্তি করিয়া, এই লইয়া নায়েব মশায়ের সঙ্গে রীতিমত বাগ্-বিতণ্ডাই হইয়া যায়।

নিত্য নূতন ফর্দ্দ তৈয়ার করিতে করিতে সরকার মশায় আর নায়েব মশায় নাজেহাল হইয়া ওঠেন।

ক্রমশঃ সবই সারা হইয়া আসে। কেবলমাত্র যখন শুধু সামিয়ানা খাটানো আর ভিয়েনের উনান পাতা বাকি—তখন হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত বুলুর একখানি চিঠি আসিয়া রাজলক্ষ্মীর সমস্ত আয়োজন লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়।

বুলু লিখিয়াছে—

পিসিমা, মনে হচ্ছে বৌ জিনিসটা বোধ হয় আমার ধাতে সইবার নয়। কাজে কাজেই তোমারও কপালে নেই।...অফিসের কাজে পাটনায় যাচ্ছি, ঘুরে এসে তোমার কাছে যাবো। প্রণাম নাও।

বুলু

কাশীবাস করিলে নাকি পরমায়ু বাড়ে

কাশীর গঙ্গার ঘাটে কাশীবাসিনী বৃদ্ধা বিধবার মরশুম দেখিলে খুব বেশী অবিশ্বাসও করা চলে না কথাটা। এই অসংখ্য বৃদ্ধার দলের মধ্যে আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া হেমপ্রভা আজও বাঁচিয়া আছেন। ছোটখাটো কৃশ দেহটি

আরও একটু কৃশ হইয়াছে, চোখের দৃষ্টিটা নিষ্প্রভ হইয়াছে মাত্র, তাছাড়া প্রায় ঠিকই আছেন।

বাড়ীতে আশ্রিত পোষ্যের সংখ্যা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। এই নতুন পাতানো সংসারের ভার চাপাইয়াছেন একটি পাতানো মেয়েরই ঘাড়ে। যেমন ভালোমানুষ, তেমনি পরিশ্রমী মেয়ে এই কমলা।

নিত্যকার মত আজও হেমপ্রভা সকালবেলা হরিনামের মালাটি হাতে দশাশ্বমেধ ঘাটের নির্দ্দিষ্ট আসরটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। একটু পরেই কমলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত।

—কি রে, কি হয়েছে ?

কমলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে—মাসীমা, শিগ্‌গির বাড়ী চলুন, একটি মেয়ে এসে আপনাকে খুঁজছে।

হেমপ্রভা অবাক হইয়া বলেন —আমাকে খুঁজছে ? কেমনধারা মেয়ে ?

আহা, একেবারে যেন সরস্বতী প্রতিমের মত মেয়ে মাসীমা! দেখলে দু'দণ্ড তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। রেলে এসেছে তাই একটু শুকনো মতন—

'সরস্বতী প্রতিমার মত' শুনিয়াই বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিয়াছে হেমপ্রভার। কিন্তু অসম্ভব কি কখনো সম্ভব হয় ?

ঝোলামালা গুছাইবার অবসরে হৃৎস্পন্দনকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে আনিতে হেমপ্রভা প্রায় হাসির আভাস মুখে আনিয়া বলেন—মরালবাহন ছেড়ে রেলে চড়ে আবার কোন্ সরস্বতী এলেন ? নাম-টাম বলেছে কিছু ?

—না। আমি শুধাতেও সময় পাই নি। আপনার নাম করে বললো—'এই বাড়ীতে অমুক দেবী আছেন না ?'—আমি শুধু একটু দাঁড়াতে বলেই ছুটে এসেছি আপনাকে খবর দিতে।

অর্থাৎ বোঝা যাইতেছে—মেয়েটিকে দেখিয়া কেন কে জানে, কমলা একটু বিচলিতই হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য সামান্য কারণে বিচলিত হওয়া তার প্রকৃতিও কতকটা।

কিন্তু হেমপ্রভার মত এমন অবিচল ধৈর্য্যই বা কয়জন মেয়েমানুষের আছে ? চলিতে চলিতে শুধু একবার প্রশ্ন করেন—কত বড় মেয়ে ?

—বড় মেয়ে। ঠিক ঠাহর করতে পারি নি কত বড়! বে-থা হয় নি এখনো। পাস-টাস করা মেয়ের মতন লাগলো।

—সঙ্গে কে আছে ?

—কেউ নয়, একা। মুখটি কেমন শুকনো শুকনো, মনে হচ্ছে যেন কোনো বিপদে পড়ে—তাই তো ছুটে চলে এলাম।

—দেখি চল্। তুই যে হাঁপাচ্ছিস একেবারে! স্বাভাবিক সুরে কথা কহিবার চেষ্টা করেন হেমপ্রভা। কিন্তু হৃদয় যতই ছুটিয়া যাক্, পা যেন চলিতে চায় না।

আবার কোন্ বিপদে পড়িয়া কে আসিল হেমপ্রভাকে স্মরণ করিতে? এক যুগ আগে আসিয়াছিল কলকাতার বাড়ীর সরকার লালবিহারী। সেই দিন হইতেই তো গত জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল যাবৎ কি দুরপনেয় গ্লানি, কি দুর্ব্বহ শোকভার একা একা বহন করিয়া আসিতেছেন তিনি, কে তাহার সন্ধান লইতেছে?

এখানের এরা জানে, কাশীবাসিনী আর পাঁচটা বিধবার মতই নিতান্ত নির্ব্বান্ধব তিনি। অবস্থা খারাপ নয়, এই যা। কাশীর এই বাড়ীখানা নিজস্ব, তাছাড়া বর্দ্ধমান জেলার কোন্ একটা গ্রাম হইতে যেন নিয়মিত একটা মোটা-সোটা মনিঅর্ডার আসে। অবশ্য তার সবটাই প্রায় ব্যয় হয় আশ্রিত প্রতিপালনে। বিধবা বুড়ীর খরচ করিবার পথই বা কি আছে আর? নিজের বিগত জীবনের কোনো গল্পই কখনো করেন নাই কাহারও কাছে।

নিতান্ত প্রয়োজন হিসাবে নিজের জন্য যতটুকু যা রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপস্বত্বে চলে হেমপ্রভার। দেশের বাড়ীর চিরদিনের বিশ্বাসী সরকার মশাইয়ের হাতে ভার দেওয়া আছে। তাছাড়া সব কিছু সম্পত্তির দায় তো তাঁহার উপরই চাপানো আছে। তাপসীর নামে দানপত্র করা বিষয়-সম্পত্তির আয়টা অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিলেও, সে সম্পত্তির দেখাশোনার কথা চিন্তাও করে না চিত্রলেখা। সরকার মশাইটি নিতান্ত সাধু ব্যক্তি বলিয়াই আজও সমস্ত যথাযথ বজায় আছে। বুক দিয়া আগ্‌লাইয়া পড়িয়া আছেন তিনি।

মণীন্দ্রর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েদের উপর এমন একটা কঠিন আদেশজারি করিয়া রাখিয়াছিল চিত্রলেখা যে তাহাদের একান্ত প্রিয় 'নানি'কে একখানি চিঠি লেখারও উপায় ছিল না।

স্বামীর মৃত্যুর পর শাশুড়ীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়াই নূতন সাজে সংসারে নামিয়াছিল চিত্রলেখা। কেমন যেন একটা ধারণা হইয়াছিল তাহার, মণীন্দ্রর অমন আকস্মিক মৃত্যুর কারণই হইতেছেন হেমপ্রভা।

তাঁহার সেই বিশ্রী বিদঘুটে কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজটার জন্যই না মাকে প্রায়

বর্জ্জন করিয়া বসিয়াছিলেন মণীন্দ্র! অবশ্য চিত্রলেখা জানিয়াছিল সেটা সাময়িক, নিতান্তই অস্থায়ী। হেমপ্রভা নিজে হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ না করিলে পুত্র আবারও 'মা' বলিয়া ভক্তিতে গদ্‌গদ হইতেন।

এই একটিমাত্র উচিত কাজ করিয়াছেন হেমপ্রভা, চিত্রলেখার প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ।

কিন্তু ছেলে মায়ের প্রভাবে অত বেশী প্রভাবান্বিত ছিলেন বলিয়াই না মাতৃবিচ্ছেদ-দুঃখ অতটা বাজিয়াছিল। যেন অহোরাত্র অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন। আশ্চর্য্য, মা বলিয়াই কি সাতখুন মাপ!

তাছাড়া বেবির ভবিষ্যৎ-চিন্তা!

চিত্রলেখার মত মণীন্দ্রও যদি সেই বিশ্রী ঘটনাটাকে চিন্তাজগৎ হইতে ঝাড়িয়া ফে'লতেন তো ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। তা নয়, সেইটা লইয়া অবিরত দুশ্চিন্তা। মনোকষ্টে ও চিন্তায় চিন্তায় ভিতরে ভিতরে জীর্ণ না হইলে কখনো অমন স্বাস্থ্য-সুন্দর দীর্ঘ দেহখানা মুহূর্ত্তে কর্পূরের মত উপিয়া যায়!

সব কিছুর মূলই তো সেই হেমপ্রভা। দৈবক্রমে স্বামীর জননী বলিয়াই কি তাঁহার প্রতি ভক্তিতে শ্রদ্ধায় বিগলিত হইতে হইবে!

এই তো চিত্রলেখারও নিজের সন্তানরা রহিয়াছে, মায়ের উপর কার কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা তা আর জানিতে বাকি নাই। এর উপর যদি আবার তাহাদের, চিত্রলেখার চিরশত্রু সেই বশীকরণ-শক্তিশালিনী 'নানি'র কবলে পড়িতে দেওয়া হয়, তবে আর রক্ষা আছে!

অতএব কড়া শাসনের মাধ্যমে তাহাদের স্মৃতিজগৎ হইতে নানির মূর্ত্তিটা মুছিয়া ফেলাই দরকার।

তাছাড়া যে কথাটা মনে আনিতেও ঘৃণা বোধ হয়, বেবির জীবনের সেই অবাঞ্ছিত ঘটনাটা—যেটাকে চিত্রলেখা বেমালুম অস্বীকার করিয়া ফেলিতে চায়, পিতামহীর সংস্পর্শে আসিতে দিলে সেটাকে জিয়াইয়া রাখার সহায়তা করা হইবে কিনা কে জানে! তাঁর নিজের পছন্দের সাধের ঘটকালির অপরূপ বিবাহ, তিনি কি সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া ছাড়িবেন!

একেই তো ওই জবুথবু সেকেলে ধরনের মেয়ে, তাহার কানে যদি 'সীতা-সাবিত্রী'র আখ্যানের ছলে বিষয়মন্তর ঢালা হয়, তাহা হইলে তো চি লেখার পক্ষে বিষ খাইয়া মরা ছাড়া অন্য উপায় থাকিবে না।

বরং সময় থাকিতে বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলাই বুদ্ধির কাজ।

তা বুদ্ধিটা যে একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে, তাই বা বলা যায় কেমন করিয়া! যথেষ্টই কার্যকরী হইয়াছে বৈকি।

স্নেহময় পিতার উদার প্রশ্রয়ের আশ্রয় হারাইয়া ভীত-সন্ত্রস্ত ছেলে-মেয়ে তিনটা দুর্দান্ত মায়ের কড়া শাসনে ছেলেবেলায় কোনো যোগসূত্র রাখিতে পায় নাই। হেমপ্রভার দিকটা সত্যই প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। বড় হইয়াও কেহ কখনো নূতন করিয়া যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করে নাই।

স্বাভাবিক অনুমানে হেমপ্রভা অবশ্য প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তবু সত্যিই কি কখনো কোনোদিন একবিন্দু অভিমান হয় নাই? তাপসী না হয় তাহার জীবনের শনিকে চিরদিনের মত বর্জন করিয়া চলুক, কিন্তু অভী? বাবলু? এই বারো বৎসরে অবশ্যই যথেষ্ট সাবালক হইয়া উঠিয়াছে তাহারা।

তবে?

দেখিতে না আসুক, একখানা চিঠিও কি আসিতে পারে না? ধরো, পরীক্ষা-সাফল্যের সংবাদবাহী? কিংবা বিজয়াদশমীর প্রণাম সম্বলিত?

হেমপ্রভা পাগল, তাই সুন্দর একটা মেয়ের নাম শুনিয়াই অসম্ভবের আশায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাছাড়া কমলার কথা তো! বেশ কিছু বাদ দিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু কে আসিতে পারে?

হেমপ্রভাকে খোঁজ করে, নাম বলিয়া সন্ধান চায়, এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পান না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একজনের কথাই মনে পড়িতে থাকে।

তাপসী ভিন্ন—

বালাই ষাট! তাপসীই বা অমন শুকনো মুখ লইয়া একা কলিকাতা হইতে কাশী ছুটিয়া আসিবে কেন? নাঃ, তার কথা উঠিতেই পারে না।

আচ্ছা এমনও তো হইতে পারে, মায়ের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় অভিমান করিয়া নানির কাছে পলাইয়া আসিয়াছে। হায় কপাল! হেমপ্রভার তেমন ভাগ্যই বটে।

হেমপ্রভার স্নেহের, হেমপ্রভার আশ্রয়ের যদি কোনো মূল্য থাকিত, তবে কি সেই ভয়ঙ্কর দিনে অমন করিয়া মণীন্দ্র ছেলে-মেয়ে তিনটাকে—

হঠাৎ সমস্ত চিন্তাস্রোতের উপর পাথর চাপা দিয়া দ্রুত পা চালাইতে থাকেন।

অত ভাবিবার কি আছে?

নিশ্চয় সম্পূর্ণ বাজে কেউ। কুমারী মেয়ে বলিল না? হয়তো কোনো প্রতিষ্ঠানের বা কোনো স্কুলের—

বাড়ী ঢুকিয়াই অবশ্য নিমেষে স্থাণু হইয়া যান।

মিথ্যা কল্পনা নয়, অসম্ভবই সম্ভব হইয়াছে। তাপসীই বটে। বাহিরের দিকের ঘরটায় একটা বড় চৌকি পাতা ছিল, তাহারই উপর চুপচাপ বসিয়া আছে। সঙ্গে মোট-ঘাটের বালাই মাত্র নাই।

তাপসী। হ্যাঁ, তাপসী বৈকি।

রোদে ঝকঝকে সকাল। আলো ভরা ঘর। ভুল করিবার কিছু নাই। বারো বছরের বালিকার উপর আরো বারো বছর ধরিয়া সৃষ্টিকর্তা তাঁহার যতই শিল্প-কৌশল প্রয়োগ করিয়া থাকুন, বার্দ্ধক্যের স্তিমিত দৃষ্টি লইয়াও হেমপ্রভার চিনিতে ভুল হয় না।

সত্যই শুকনো শুকনো মুখ, এলোমেলো উস্কো চুল, চোখের নীচে কালির রেখা। বিপদের সংবাদ বহিয়া আনার মতই চেহারাটা বটে।

কিন্তু এমন কি বিপদ ঘটিতে পারে যে তাপসীকে আসিতে হয় সে সংবাদ বহন করিয়া?

তবে কি চিত্রলেখাও মণীন্দ্রর পথ অনুসরণ করিল?

অসম্ভব কি? হেমপ্রভার মত এত বড় দুর্ভাগিনী জগতে আর কে আছে, যথাসময়ে মরিয়াও মুখরক্ষা করিতে পারে না?

—তাপসী! তুই! চৌকিটার উপরই বসিয়া পড়েন হেমপ্রভা।

তাপসী মৃদু হাসিয়া বলে—আমি নয়, আমার ভূত। সারাদিন বুঝি গঙ্গার ঘাটেই থাকো তুমি?

—থাকি বৈকি। ভাবি রোজ দেখতে দেখতে যদি দৈবাৎ মা-গঙ্গার দয়া হয় কোনোদিন। কিন্তু তুই হঠাৎ এরকম করে চলে এলি কেন তাই বল্ আমায়! এ যে বিশ্বাস হচ্ছে না। বুঝতে পারছি না আমি, আনন্দ করবো, না আতঙ্কিত হয়ে বসে থাকবো?

তাপসী স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসির সঙ্গে বলে—সে কি গো নানি, কতদিন পরে দেখলে—কোথায় আনন্দে অধীর হয়ে উঠবে, তা নয় ভেবেচিন্তে অঙ্ক কষে ঠিক করবে, কি করা কর্ত্তব্য?

যাক, ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ কিছু নাই তবে!

ঈষৎ ধাতস্থ হইয়া হেমপ্রভা বল্লেন—'আনন্দ' কথার বানান ভুলে গেছি

তাপস। তুই হঠাৎ এরকম একলা একবস্ত্রে এভাবে চলে এলি কেন না শুনে স্থির হতে পাচ্ছিনে!

—এমনি! তোমায় দেখতে ইচ্ছা হলো, ভাবলাম কোন্ দিন কাশী লাভ করবে, দেখাই হবে না আর! তা—

—ও কথা আর যাকে বোঝাবি বোঝাগে যা, আমায় বোঝাতে আসিস নি তাপস। আমার মন কেবল 'কু' গাইছে। কি হয়েছে বল্! শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে—

—কি মুস্কিল! তাপসী যেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলে—বুড়ী হলেই কি ভীমরতি হতে হয় গো! একটা মানুষ সারারাত ট্রেনে চড়ে, খিদেয় তেষ্টায় কাতর হয়ে এসে পড়লো—তাকে 'কেন এসেছিস' 'কি জন্যে এসেছিস' এই নিয়ে কেবল জেরার ওপর জেরা! থাকতে না দাও তো বলো, চলেই যাই!

—বালাই ষাট্—দুগ্‌গা দুগ্‌গা। আমি যে দিবানিশি এই আশাটুকু বুকে নিয়েই দিন কাটাচ্ছি এখনো। একবার তোদের চাঁদমুখগুলি দেখবো। কিন্তু এমন আচমকা হঠাৎ এলি, ভয়ে বুক কেঁপে উঠলো। বল্ সবাই ভালো আছে তো?

—আছে আছে।

—কিন্তু তোকে তো ভালো দেখছি না। হেমপ্রভা সন্দিগ্ধভাবে বলেন—তুই আছিস কেমন?

—খুব ভালো। তোমায় যে এখনো প্রণাম করাই হয় নি গো! গাড়ীর কাপড়ে ছোঁবো নাকি?

বাল্যের শিক্ষা আজও বিস্মৃত হয় নাই দেখা গেল। অভিভূত হেমপ্রভা এতক্ষণে দুই বাহু বাড়াইয়া বুকে জড়াইয়া ধরেন তাঁহার চির আদরের আদরিণীকে। অভী বাবলু যতই মূল্যবান হোক, তবু তাপসীর মূল্য আলাদা।

সংসারের প্রথম শিশু।

মণীন্দ্রর প্রথম সন্তান।

কমলার উপস্থিতির কথা আর স্মরণ থাকে না, চির-অবিচলিত হেমপ্রভা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন।

কে জানে তাপসীর চোখের খবর কি! পিতামহীর বুকের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে বলিয়াই হয়তো লোকচক্ষে মান-সম্ভ্রমটা বজায় রহিল।

স্নানাহারের পর হেমপ্রভা আবার তাহাকে লইয়া পড়েন। তাপসীর এই আসাটা যে কেবলমাত্র নাতিনির কাশীপ্রাপ্তি হইবার ভয়ে দর্শনলাভের আশায়

ছুটিয়া আসা নয়, সেটুকু বুঝিবার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে তাঁহার।

কিন্তু তাপসী কেবলই হাসিয়া উড়ায়।

বলে—ভালো বিপদ হয়েছে দেখছি, এমন জানলে আসতাম না। নাবালক ছিলাম, একা আসবার সাহস হতো না। এখন সাবালক হয়েছি, তাই এলাম একবার।

হেমপ্রভা হাসিয়া বলেন—হঠাৎ সাবালক হয়ে উঠলি কিসের জোরে? তোর মা'র কবল থেকে কারুর সাবালক হওয়া সোজা ক্ষমতা নয়।

—মাকে তুমি বড্ড চিনে ফেলেছো নাকি, তাই না! সত্যিই অনেক ক্ষমতার দরকার। তাই তো পালিয়ে এলাম।

—সেই কথাটাই বল্—'পালিয়ে এলি'! আচ্ছা এখন আর পীড়াপীড়ি করবো না, সময়ে শুনবো। তোদের আর সব খবর শুনি। অভী, বাবলু কতদূর কি পড়লো-টড়লো এতদিনে? তুই কি করছিস? সরকার মশায়ের চিঠিতে ভাসা-ভাসা একটা খবর কদাচ কখনো পাই মাত্র।

হেমপ্রভার কেমন একটা ধারণা হয়—তাপসী বড় হইয়া বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারিণী হইয়া, এতদিনে নিজের জীবনের একটা সুব্যবস্থার চেষ্টায় হেমপ্রভার কাছে আসিয়াছে, সেই তাহার বিবাহ-অভিনয়ের নায়কের তত্ত্ব লইতে।

গুরু রক্ষা করিয়াছেন যে চিত্রলেখা আক্রোশের বশে আর একটা বিবাহ দেবার চেষ্টা করে নাই! যতই হোক হিন্দুর মেয়ে তো! কিন্তু সত্যিই যদি প্রশ্ন করে তাপসী, কি সদুত্তর দিবেন হেমপ্রভা? বুলুর সন্ধান লইবার চেষ্টা কয়েকবারই তো করিয়াছিলেন তিনি, কিন্তু যোগাড় করিতে পারিয়াছেন কই? প্রত্যেকবারই সরকার মশাই লিখিয়াছেন—'শুনিতে পাওয়া যায় ছেলেটি লেখাপড়া শিখিবার জন্য বিলাতে গিয়াছে।'

বিলাতে পড়িতে গেলে কতকাল লাগে? কি সে পড়া? ইদানীং আর চেষ্টা করেন নাই হেমপ্রভা। কি বা প্রয়োজন—তাঁহার দ্বারা আর কাহারও কিছু হইবার আশা যখন নাই! চিত্রলেখার ইচ্ছা হয় খোঁজখবর লইয়া মেয়ে পাঠাইবে। ইচ্ছা না হয়—তাপসীর ভাগ্য।

অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া নিজেকে 'নিমিত্তের ভাগী' মনে করাটাও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তিনি। আজ সহসা তাপসীকে দেখিয়া অপরাধ বোধটা নূতন করিয়া মাথা চাড়া দেয়। দোষ যাহারই হোক, এমন মেয়েটা মাটি হইয়া গেল।

কি কুক্ষণেই নাম রেখেছিলেন "তাপসী"! তপস্যা করিয়াই জীবন যাইবে।

নিজের সংস্কারের দৃষ্টি দিয়াই বিচার করেন হেমপ্রভা। এছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব, সে চিন্তাও আসে না।

বহুযুগসঞ্চিত পুরুষানুক্রমিক সংস্কার।

যে সংস্কারের শাসনে লোকে বালবিধবাকে অনায়াসে মানিয়া লয়। পতি-পরিত্যক্তার ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।

এত কথা ভাবিতে অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগিযাছে।

তাপসী প্রায় কথার পিঠেই উত্তর দেয়—অভী ডাক্তারি পড়ছে, বাবলু ঢুকেছে ইঞ্জিনিয়ারিংএ। ওদের জন্যে অনেক কিছুই তো ইচ্ছে ছিল মা'র, হলো আর কই? কত খরচ লাগে!

মণীন্দ্রর অভাবটা দুজনেরই মনে বাজে, স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। মিনিট খানেক নিঃশব্দ থাকিয়া হেমপ্রভা বলেন—আর তুই—তুই কি করছিস্?

—আমি? তাপসী হাসিয়া বলে—আমি স্রেফ বেকার। কলেজের কবল থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত একটা চাকরি-বাকরিতে ঢুকে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট করছি, মা'র শাসনে হচ্ছে না। কাজেই খাচ্ছি-দাচ্ছি, শাড়ীগয়না পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

হেমপ্রভা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলেন—চাকরিতে ঢুকবি বলে ছট্‌ফট করছিস্! চাকরি করবি তুই?

—করবো না কেন, তাই বলো? দোষ কি? জীবনটা তো মাঠেই মারা গেলো। গেরস্তদের এত এত টাকাকড়ি খরচা করে লেখাপড়াগুলো শিখলাম, সেটাও মাঠে মারা যাবে?

নাতনীর কথায় আর একবার ধৈর্য্যচ্যুত হন হেমপ্রভা।

পরিহাসচ্ছলে নিতান্ত অবহেলায় উচ্চারিত তাপসীর নিজের জীবনের এই মর্ম্মান্তিক সত্যটা যেন সহসা চাবুক মারিল তাঁহাকে।

সত্যই তো, জীবনটা মাঠে মারা যাইবার এত প্রচণ্ড দৃষ্টান্ত একালে আর কবে কে দেখিয়াছে!

অবাধ্য চোখের জলকে খানিকটা ঝরিতে দিয়া হেমপ্রভা গভীর আক্ষেপের সুরে বলেন—তা তুই বলতে পারিস্ বটে। কিন্তু হ্যাঁরে, তোর মা কি সেই হতভাগা ছোঁড়াটার খোঁজখবর কিছু করে না?

তাপসী কথাটা বলিয়া ফেলিয়া যেটুকু অপ্রতিভ হইয়াছিল, সেটুকু সামলাইয়া

লইবার সুযোগ পাইয়াই যেন সকৌতুকে হাসিয়া ওঠে। হাসিয়া ফেলিয়া বলে —কেন গো, কি দুঃখে? আমার মা অমন হতভাগা লোকদের খুঁজে বেড়াবার মেয়ে নয়। খুঁজে খুঁজে যত রাজ্যের ভাগ্যবন্তদেরই এনে হাজির করছে, যদি কিছু সুরাহা হয়। আমিই একটা রাবিশ!

কথাটা মিথ্যা নয়। মেয়ে থার্ড ইয়ারে পড়ার বছর হইতেই চিত্রলেখা মাঝে মাঝে এক-আধটি সম্ভাবিত পাত্র খুঁজিয়া আনিয়া মেয়ের চোখের নাগালে ধরিয়াছে। তবে তাপসীর মনের নাগাল পাইবার সৌভাগ্য কাহারও ঘটে নাই, এই যা দুঃখ। তাপসীর সহজ প্রসন্নতার কঠিন বর্মের আঘাতে লাগিয়া তাহাদের যত্নসঞ্চিত তৃণের সব রকম অস্ত্রই ফিরিয়া গিয়াছে।

অথচ মায়ের এই চেষ্টার জন্য মায়ের কাছে কোনদিন অনুযোগ করে নাই মেয়ে, সেইটাই তো আরো অসুবিধা চিত্রলেখার। কথা কাটাকাটির পথে তবু যুক্তিতর্কগুলা বলিয়া লওয়া যায়। কিন্তু বেবির অদ্ভুত চাল যেন বুঝিতেই পারে না এমন ভাব।

শুধু কিরীটীর বেলাতেই ঘটনার স্রোত পাল্‌টাইয়াছে—আগাইয়াছে।

আত্মপ্রসাদ-প্রসন্ন চিত্রলেখা ভাবিয়া সন্তুষ্ট ছিল—যাক্, এতদিনে মনের মতনটি আনিয়া সামনে ধরিয়া দিতে পারিয়াছে। মেয়ের পছন্দটি দিব্য রাজসই বটে। তাই এতদিন কাহাকেও মনে ধরে নাই।

কিন্তু শেষরক্ষা হইল না।

তাপসীর কথা শুনিয়া মিনিটখানেক গুম্ হইয়া যান হেমপ্রভা। বধূ সম্বন্ধে 'যতই হোক হিন্দুর মেয়ে' বলিয়া নিজের মনকে তিনি যতই চোখ ঠারুন, এমনি একটা আশঙ্কা কি মনে মনে ছিল না তাঁহার? তাপসীর সিন্দুরবিহীন সীমন্ত দেখিয়া সম্প্রতি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন এই যা। সিন্দুরবিহীনতাটুকু চোখে বাজিলেও, নূতন প্রলেপ যে পড়ে নাই এই ঢের। ও সংস্কারটাকে উড়াইয়া দিয়া অস্বীকার করিতে চায় করুক, বিবাহটা অস্বীকার করে নাই তো!

এই নূতন সংবাদে খানিকটা চুপ করিয়া থাকার পর তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেন —তা সুরাহা কিছু হলো না কেন?

অর্থাৎ নাতনীর মনটাও জানিতে চান।

তাপসী ভালোমানুষ বলিয়া বোকা নয়। পিতামহীর মনোভাব বুঝিতে দেরি লাগে না তাহার। মুখের হাসি সমান বজায় রাখিয়াই বলে—হলো আর

কই? ভাগ্যটাই যে মন্দ। আহা বেচারা, কত চেষ্টায় কত যত্নে বাজারের সেরা মানিকটি এনে গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছিলেন, আমারই বরদাস্ত হলো না। পালিয়ে প্রাণ বাঁচালাম।

ওঃ, তাই বটে। আহা-হা, এ মেয়েকেও আবার সন্দেহ করিতেছিলেন তিনি!

সতী মেয়ে মায়ের অন্যায় উৎপীড়নে শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। বাছা রে! বিগলিত স্নেহে হেমপ্রভা তাহাকে প্রায় কোলে টানিয়া লইয়া বলেন—বাছা রে! কত কষ্ট পেয়েছো, মরে যাই! জানি তো তোর মাকে, এই ভয়ই ছিল আমার। দেখছি ভগবান আবার আমাকে সংসারের পাকে জড়াতে চান। মস্ত কর্ত্তব্যের ত্রুটি রেখে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে ডাকতে বসলেও তো উচিত কাজ হয় না। যাকৃগে, তুই যে পালিয়ে এসে এখানে এসে পড়েছিস্, ভালোই করেছিস্। দেখি আমার দ্বারা কি হয়—

—দোহাই নানি, আর কিছু হওয়াবার চেষ্টা কোরো না তুমি। একটা কাজকর্ম্ম খুঁজে নেওয়া পর্য্যন্ত তোমার এখানে থাকতে দাও শুধু, তাহলেই হবে।

—আমার ওপর তোর বড় অবিশ্বাস, না? তা হতে অবিশ্যি পারে। কিন্তু ভুলকে শোধরাবার সুযোগও একবাব দিতে হয়। চাকরির কথা মুখে আনিস নি আমার সামনে। এখন দয়া করে তোর মা আমার কাছে দু'দিন থাকতে দেয়, তবে তো! থানা-পুলিস করে কেড়ে নিয়ে না যায়!

—বাঃ, মা কি করে জানবেন এখানে আছি!

হেমপ্রভা সচকিতে বলেন—একেবারে কিছুই জানিয়ে আসিস্ নি নাকি?

—না তো!

—ছি ছি! এ কাজটা তো তোমার ভালো হয় নি তাপস। আমি বলি বুঝি মায়ের ওপর রাগ করে চলে এসেছিস। চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিস তাহলে? বড় নির্বুদ্ধির কাজ হয়েছে।

তাপসী ম্লান হাসির সঙ্গে বলে—আমার অবস্থায় যদি পড়তে, দেখতাম তোমারই বা কত বুদ্ধি খুলতো!

—বুঝেছি। অনেক যন্ত্রণা না পেলে এমন কাজ করতে না তুমি। শুনবো, সব শুনবো রাত্তিরে। কিন্তু এখুনি তো একখানা 'তার' করে দিতে হয়

কলকাতায়।

—বা রে, বেশ তো! আমি বলে কত কষ্ট করে লুকিয়ে পালিয়ে এলাম, এখনই তাড়াতাড়ি বলে পাঠাব—'টু! আমি এখানে লুকিয়েছি!'

হেমপ্রভা হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—আচ্ছা তোকে বলতে হবে না। আমিই কাউকে দিয়ে অভীর নামে 'তার' পাঠিয়ে দিচ্ছি। মেয়েমানুষ জাত যে বড় সর্ব্বনেশে পরাধীন জাত। রাগ করে বাড়ী ছেড়ে পালাবার স্বাধীনতাই কি আছে তার? ঘরে পরে সকলে সন্দেহ করবে। কেউ বিশ্বাস করবে না একলা পালিয়ে এসেছিস্। আমার কাছে এসে পড়েছিস্ এই মস্ত রক্ষে, যত তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।···যাই দেখি রাজেন বাড়ী আছে কিনা।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া দুইজনেরই প্রায় জাগিয়া রাত ভোর হইয়া যায়।

খুঁটিয়া খুঁটিয়া নানা প্রশ্নের সাহায্যে অনেক তথ্যই আবিষ্কার করেন হেমপ্রভা। মনটা যে খুব প্রসন্ন থাকে, এমন বলা যায় না। নিজের অবস্থা এবং ঘটনার বর্ণনা করিতে মিস্টার মুখার্জ্জি নামধারী ব্যক্তিটির সম্বন্ধে যতই অগাধ উদাসীনতা দেখাক তাপসী, যতই মায়ের "সেই পরম অমূল্য রত্নটি" বলিয়া উল্লেখ করুক, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী পিতামহীর দৃষ্টির সামনে তাহার প্রকৃত মনের চেহারা ধরা পড়িতে দেরি হয় না। এই পলায়ন তাহার তবে মায়ের জবরদস্তির কাছে অসহায় হইয়া নয়, আপন হৃদয়ের কাছেই অসহায়তা! মুখোমুখি সত্যের সম্মুখ হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম হৃদয় লইয়া ভীরু পলায়ন অপ্রসন্ন হইলেও একেবারে ধিক্কার দিতে পারেন না।

আরো কঠিন আরো দৃঢ় হইলেই অবশ্য ভাল ছিল, কিন্তু এই শোভাসম্পদময়ী ধরণীতে, জগতের যাবতীয় ভোগের উপকরণের মাঝখানে বসিয়া এই অপরূপ-রূপ-যৌবনের ডালিখানি অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া 'দেবী' বনিয়া থাকা কি এতই সহজ! বাল-বিধবার তবু তো কৃচ্ছ্রসাধন বরাদ্দ!

কয়েক দিন কাটে।

চিত্রলেখার নিকট হইতে টেলিগ্রামেই সংক্ষিপ্ত জবাব আসিয়াছে—'ধন্যবাদ। নিশ্চিন্ত।' কন্যার প্রচণ্ড দুর্ব্যবহারে চিত্রলেখা কিরূপ পাষাণ বনিয়া গিয়াছেন,

ভাষাটা তাহারই নিদর্শন।

তবু পিতামহীর সঙ্গে সমস্ত কাশী শহরটা প্রদক্ষিণ করিয়া এবং অসংখ্য দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বেড়াইতে মন্দ লাগে না। অনাস্বাদিত বৈচিত্র্য। কাশীর বাজার হইতে কেনা সাদাসিধে কয়েকটা শাড়ী জামা—চিত্রলেখার কাছে যাহা একান্ত দীনবেশ, তাই পরিয়া অক্লেশে ঘুরিয়া বেড়ায় তাপসী। যে মূল্যবান নূতন রেশমী শাড়ীখানা বিবাহের 'পাকা দেখা' হিসাবে আসিবার কালে পরনে ছিল, সেখানা নিতান্ত অনাদরে দড়ির আলনায় ঝুলিয়া ধূলা খাইতে থাকে।

এত ঘোরায় অনভ্যস্ত ক্লান্ত হেমপ্রভা রাত্রে বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মড়ার মত ঘুমাইয়া পড়েন, জানিতেও পারেন না পার্শ্ববর্ত্তিনীর কুসুম-সুকুমার হাল্কা দেহখানির মধ্যে কি উত্তাল সমুদ্র তোলপাড় করিতে থাকে, কি দুরন্ত কালবৈশাখীর ঝড় বয়!

বিনিদ্র রজনীর সাক্ষ্য থাকে শুধু বিনিদ্র নক্ষত্রের দল।

কোটিকল্পকাল ধরিয়া যাহারা বহুকোটি মানবের বিনিদ্র রজনীর হিসাব রাখিয়া আসিতেছে।

দিন কয়েক পরে।

গঙ্গাস্নানে যাইবার আগে হেমপ্রভা সুদৃশ্য একখানি ভারী খাম হাতে করিয়া বেজার মুখে নাতনীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—এই নাও, তোমার চিঠি।

ঠিকানাটা টাইপ করা, হাতের লেখা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই, তবু কি একটা আশার আশঙ্কায় বুকটা থরথর করিয়া ওঠে তাপসীর, হাত বাড়াইয়া লইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকে না

—কই, খোল্ তো দেখি কি লিখেছে! কার চিঠি?

—বুঝতে পারছি না—বলিয়া তাপসী বন্ধ খামখানাই নাড়াচাড়া করিতে থাকে। খুলিবার লক্ষণ দেখায় না।

—খুলেই দেখ্ না—'হাতে পাঁজি মঙ্গলবারে'র দরকার কি? এ বোধ করি তোমার মা'র সেই অমূল্যরত্ন "মিস্টার মুখুজ্জে" না কে যেন তারই হবে! আস্পদ্দাকে বলিহারি দিই বাবা, বেচারা এই দূরদূরান্তরে এসে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাও নিস্তার নেই। চিঠি লিখে উৎখাত করতে এসেছে গো!…তুই খোল্ তো, দেখি আমি কি লিখেছে সে! কড়া করে উত্তর দিয়ে দিবি, বুঝলি! লিখবি—'তোমার সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখবার ইচ্ছে আমার নেই।'

তাপসী উত্তর দেয় না, হয়তো দিতে পারেই না—ঘামে ভেজা 'থরথর

কম্পিত' মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া খামখানার অবস্থা শোচনীয় করিয়া তোলে।

হেমপ্রভা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার নাতনীর মুখের চেহারাটা দেখিয়া লইয়া বলেন—অবিশ্যি তোমার নিজের মন বুঝে কথা। দেহটা নিয়ে পালিয়ে আসা যায়, মন নিয়ে তো পালানো যায় না। তুমি যদি তোমার ধিঙ্গি মায়ের মতলব মত ওই ছোঁড়াকেই—দুর্গা দুর্গা! থাক্—বলবার আমার কিছু নেই। নিজের বিবেচনায় কাজ করবার সাহসও আর নেই। যা ভাল বুঝবে করবে।

অন্যমনস্ক তাপসী বোধ করি ঠাকুমার শ্লেষটা বুঝিলেও কারণটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, অসহায় অন্যমনস্ক স্বরে বলে—আমার জন্যে কেউ তো কোনোদিন কোনো বিবেচনাই করলে না নানি! তুমি পালিয়ে এলে কাশী, বাবা চিরদিনের মত পালালেন, পড়ে রইলাম মা'র হাতে। স্বপ্নের বর স্বপ্ন হয়েই রইল, আমি কি করি বলো তো!

হেমপ্রভা আহত অপ্রতিভভাবে বলেন—জানি দিদি, বুঝি তোর ওপর সবাই অবিচার করেছে। দারুণ অভিমানে পালিয়ে এসেছিলাম, কর্ত্তব্য ঠিক করতে পারি নি। মণি যখন চলে গেল, তখন আমারই উচিত ছিল যেমন করে হোক তোর আখেরের ব্যবস্থা করা। দেরি হয়ে গেছে, তবু পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবার করবো আমি। একেবারে তোকে নিয়েই যাবো কুসুমপুর। কেউ না থাক্, কান্তি মুখুজ্জের প্রতিষ্ঠিত 'রাইবল্লভের' মন্দির তো আছেই, সেখানে গিয়ে খোঁজ করবো। দেখি সে ছোঁড়া কি ক'রে অবহেলা করে তোকে! শুনেছিলাম বিলেত-মিলেত গেছে নাকি। ভগবান জানেন, মেম বিয়ে করে বসে আছে কিনা। তাহলেও আমি সহজে ছাড়বো না।

তাপসী মৃদু হাসির সঙ্গে বলে—মানুষ তো অমর নয় নানি। তোমার দেওয়া শাস্তিভোগ করতে আসামী টি'কে থাকলে তো!

হেমপ্রভা শিহরিয়া ওঠেন। ঠিক এই ধরনের একটা আশঙ্কা কি তাঁহার নিজেরই নাই? ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে—হয়তো এত নিস্পৃহ হইয়া থাকিবার কারণও তাহাই। কুমারীর মত আছে থাক্—কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া কি শেষটা সাপ বাহির করিয়া বসিবেন?

কিন্তু এ অবস্থাও আর সহনীয় নয়। যা থাকে কপালে, দেশে একবার যাইবেনই তিনি এবার। আর যাই হোক—পিসশাশুড়ী বুড়ীটা নিশ্চয়ই ঠিক বেঁচে আছে। বিধবা মেয়েমানুষের কাঠপ্রাণ, ও আর যাইবার নয়। কিছু

সুরাহা যদি নাই হয়—আচ্ছা করিয়া একবার দশকথা শুনাইয়া দেওয়ার সুযোগ না হয় হোক্।

কেন? দোষ কি শুধু এ পক্ষেরই? কান্তি মুখুজ্জের অবিমৃষ্যকারিতাই কি তাপসীর জীবনটা মাটি করিয়া দিবার যথার্থ কারণ নয়? সে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল তাহাদেরই।

রাজলক্ষ্মী যে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, সেটা না হেমপ্রভা, না তাপসী কাহারও জানা নাই।

যাই হোক—ভিতরে ভিতরে যত আশঙ্কাই থাক, মুখে দমেন না হেমপ্রভা। 'ষাঠ্ ষাঠ্' করিয়া ওঠেন—অলুক্ষণে কথা মুখে আনিসনে তাপস। দুর্গা দুর্গা। মেম মায়ের কাছে এই শিক্ষাটাই হয়েছে বুঝি! যা নয় তাই মুখে আনা! মনে রাখিস্ সাবিত্রীর দেশের মেয়ে তুই। যমের বাবার সাধ্যি হবে না তোর আশার জিনিস কেড়ে নিতে!

তাপসী অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

হাতের খামখানা খুলিয়া দেখিবার আগ্রহও যেন শিথিল হইয়া যায়। সাবিত্রীর দেশের মেয়ে সে? তাই তো! এ কথাটা এত স্পষ্ট করিয়া কেউ তো কোনোদিন বলিয়া দেয় নাই।

খামখানা হাতের মধ্যে নিপীড়িত হইতে থাকে।

না পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার মত মনের জোর থাকিতে পারে না তাপসীর? সাবিত্রীর দেশের মেয়ে হইয়াও না?

গঙ্গাস্নানের দেরি হইয়া যায় দেখিয়া হেমপ্রভা তখনকার মত আর চিঠির বিষয়বস্তু দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না, ঝোলামালা লইয়া বাহির হইয়া যান।

আর তাপসী?

চিঠিখানার বিষয়বস্তু জানিবার প্রয়োজন কি তাহারও নাই আর?

জ্ঞান অবধি যে সংগ্রাম জীবনের সাথী, স্পষ্ট করিয়া আবার একবার তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইতেছে তাপসীকে। লোভের সঙ্গে সততার সংগ্রাম, বাস্তবের সঙ্গে সংস্কারের।

তাপসী কি হার মানিবে?

হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এক মুহূর্তের জন্য আঙুলের ডগায় কেন্দ্রীভূত করিয়া খামটা একবার ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলেই তো সব চুকিয়া যায়!

আচ্ছা, এমনও হইতে পারে, সব সন্দেহই অমূলক—নেহাৎ কোনো বাজে লোকের চিঠি! লিলির হইতেই বা বাধা কি? বন্ধু বলিতে অবশ্য কেহই নাই তাপসীর, তবু আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া লিলিও তো জিজ্ঞাসা করিতে পারে—তাপসীর অমন সৃষ্টিছাড়া ভাবে পলাইয়া আসার কারণ কি?

অভীও পারে না প্রকাণ্ড এক চিঠি লিখিতে?

তাপসীর পলাইয়া আসার অর্থ জানিতে চাওয়ার অধিকার তাহারও থাকিতে পারে।

কিংবা মা?

তাপসী কিভাবে তাঁহার মুখে চুনকালি লেপিয়াছে, উঁচু মাথাটা হেঁট করিয়া দিয়াছে, সেইটাই শুনাইয়া দিবার মত উপযুক্ত ভাষা হয়তো এতদিনে সংগ্রহ করিয়াছেন তিনি।

টাইপ-মেশিনের নিষ্প্রাণ অক্ষরগুলো নিতান্তই নীরব দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া থাকে, কোনো উত্তর দেয় না।

বোকার মত আগেই ছিঁড়িয়া ফেলার তো মানে হয় না কিছু।

তবু হঠাৎ সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করিয়া খাম-সমেত চিঠিখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দেয় তাপসী।

না, হেমপ্রভার কাছে খেলো হইতে রাজী নয় সে। বুঝুন তিনি, কাহারও উপর কোনো মোহ নাই তাপসীর। সাবিত্রীর দেশের মেয়ে শুধু যে নিজের 'এয়োতি' রক্ষা করিতেই জানে তা নয়, আপন সম্মান রক্ষা করিতেও জানে।

জগতে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। নিতান্ত কল্পিত গল্পের মত ঘটনাও সত্যসত্যই ঘটিতে দেখা যায় মাঝে মাঝে। দৈবাৎ হইলেও হয়। সেই দৈবাতের ব্যাপার আজ ঘটিতে দেখা গেল হেমপ্রভার জীবনে।

স্পষ্ট করিয়াই বলি। নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে দিশাহারা হেমপ্রভা যখন স্নানান্তে 'মালাজপের' ছুতায় বসিয়া ইতিকর্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটি ভদ্রমহিলা সামনে আসিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করেন—একটা কথা বলবো শুনবেন? কিছু মনে না করেন তো সাহস করে বলি!

বিস্মিতা হেমপ্রভা তাকাইয়া দেখেন—বার্দ্ধক্যের ক্ষীণদৃষ্টি এবং সোজাসুজি রৌদ্রের ঝলসানি, দুটায় মিলিয়া চোখটা কেমন ধাঁধাইয়া দেয়। চিনিতে পারেন না মানুষটা কে?

ভদ্রমহিলা আবার বলেন—মনে হচ্ছে ভুল করি নি, তবু সন্দেহ ভঞ্জন করতে শুধোচ্ছি, কাশীতে আপনি কতদিন আছেন মা?

হেমপ্রভা গম্ভীরভাবে বলেন—তা অনেকদিন। কেন বল তো জানতে চাইছো?

—চাইছি আমার বিশেষ দরকারে মা। আচ্ছা আপনার দেশ কোথায়?

কৌতূহলী হেমপ্রভা এবার ঝোলামালা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলেন—ঘাট ছেড়ে ছায়ার দিকে চলো তো বাছা, দেখি তুমি কে?

দুইজনেই ছায়ার দিকে সরিয়া যান।

ভদ্রমহিলা এবারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলেন—নিজের পরিচয় দেবার মতন না হলেও দেবো বৈকি মা, তবু আমার প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিন।

হেমপ্রভা অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অপরিচিতার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া সংক্ষেপে বলেন—দেশ আমার বর্দ্ধমান জেলায়।

—গ্রামের নাম? সাগ্রহ স্বর ধ্বনিত হয় ভদ্রমহিলার কণ্ঠে।

—কুসুমপুর। কেন বল তো? চিনতে তো পারছি না কই!

—আমি কিন্তু ঠিক চিনেছি মা। বিশ্বনাথ মুখ রেখেছেন মনে হচ্ছে। পরিচয় দিলে চিনবেন নিশ্চয়ই। আমি স্বর্গীয় কান্তি মুখুজ্জে মশায়ের ভাগ্নী, বুলুর পিসিমা। চেনেন তো কান্তি মুখুজ্জেকে?

'চিনি না আবার'! একথা বলিতে ইচ্ছা হইলেও রসনায় যেন শব্দ যোগায় না হেমপ্রভার। এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া যান তিনি।

সত্যই কি তবে ভগবান প্রত্যক্ষ আছেন? এই ঘোর কলিতেও? অন্তরের যথার্থ ব্যাকুলতা লইয়া যা কিছু প্রার্থনা করা যায়, হাতে তুলিয়া দেন তিনি?

নাকি হেমপ্রভাকে ছলনা করিতে, ব্যঙ্গ করিতে বুলুর পিসির ছদ্মবেশ ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন? এখনই আবার মিলাইয়া যাইবে এই মায়ামূর্ত্তি?

বাক্‌শক্তিকে ফিরাইয়া আনিয়া হেমপ্রভা যা বলেন, তাতে কিন্তু অন্তরের এই উচ্ছ্বসিত ব্যাকুলতা ধরা পড়ে না, নিস্পৃহ স্বরে বলেন—আমাকে তো চিনেছো, বলো দিকিন্ কি সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয়?

রাজলক্ষ্মীর হেমপ্রভার মত আপন হৃদয়যন্ত্রের উপর এত নিয়ন্ত্রণ নাই, তাই অর্দ্ধরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন—সেকথা আর জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না মা। আপনার কাছে মস্ত অপরাধী আমরা। তবু বলি দশচক্রে ভগবান ভূত! অনেকবার অনেক মিনতি করে লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে হতাশ হয়ে ভেবেই না চুপ

করে গিয়েছি মা! ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না এলে কি ঘর মানায়? তা আমারই হতভাগ্যির দোষ, কোনো সাধই মিটলো না।

হেমপ্রভা যে কলিকাতার কোন খবরই প্রায় রাখেন না, সেই হইতে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন, সে ধারণা নাই রাজলক্ষ্মীর, থাকিবার কথাও নয়।

—ভাগ্যের দোষ বৈকি বাছা, বিধাতার বিধান রদ করবে কে। তা ভাইপোর আবার বিয়ে দিলে কোথায়?

আপন মান বাঁচাইতে হেমপ্রভা এই রকম বাঁকা পথে প্রশ্নটা করেন।

'আবাব বিবাহ দাও নাই তো'—প্রশ্নটা বড অপমানকর! দিলে কোথায়—এ যেন একটা নিশ্চিত ঘটনা সম্বন্ধে বাহুল্য প্রশ্ন। যেন বিবাহটা অতি সাধারণ একটা সংবাদ মাত্র। যেন ইহার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে না হেমপ্রভার। যেন উত্তরের অপেক্ষায় রুদ্ধশ্বাস বক্ষে ইষ্টনাম জপ করিবার দরকার হয় না। যেন বাজলক্ষ্মীর ভাইপোর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মাথাব্যথা নাই হেমপ্রভার।

এ প্রশ্নটার পরেই দেশের ধানচালের ফলন অথবা মাছ-দুধের মূল্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে কিছুমাত্র বিকার দেখা যাইবে না বোধ হয়।

রাজলক্ষ্মী এ চাল জানেন না। এইভাবে উৎকণ্ঠাকে দাবাইয়া নিস্পৃহতার ভান করার 'চাল'। তাই হেমপ্রভার প্রশ্নে তিনি যেন মনের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারেন না। নিজেদের মহত্ত্বের পরিচয় দিবার এত বড় সুবর্ণ সুযোগ—এ কি কম কথা!

যে নিদারুণ ঘটনার জন্যই মনের দুঃখে দেশত্যাগী হইয়াছেন রাজলক্ষ্মী, পোড়ারমুখো বিধাতাকে কমপক্ষে লক্ষবার গালাগাল করিয়াছেন, সেই ঘটনাটাই এখন দেবতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে হয়।

অতএব উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া অনায়াসেই বলিতে পারেন তিনি—বিয়ে! না মা, আমার ভাইপো তেমন ছেলে নয়। মামা যা করে গেছেন, তার ওপর কলম চালানো—সে হতে পারে না।

প্রায় পাকিয়া ওঠা 'বিবাহ' ফলটি যে হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর অজ্ঞাত কারণে পাকিবার পরিবর্ত্তে খসিয়া গিয়াছে, সেটা আর প্রকাশ করেন না।

হেমপ্রভার হাতের মালা দ্রুত ঘুরিতে থাকে।

গুরুদেব, মুখ রাখিয়াছো তবে! তাপসীর কাছে নূতন করিয়া অপদস্থ

হইবার মত কিছুই ঘটে নাই দেখা যাইতেছে! এখন শুধু স্বভাব-চরিত্র বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্ধান নেওয়া। আছেই বা কোথায় কে জানে? তবু প্রায় অবহেলাভরে বলেন—কি করছে এখন ভাইপো?

—বুলু? তা আপনার আশীর্ব্বাদে মানুষের মতন মানুষ একটা হয়েছে। বড় দুঃখু যে মামা কিছুই দেখতে পেলেন না। কত সাধ ছিল তাঁর, তা সে সাধ মিটতো। বুলু আমার এখানে দুটো পাস করে জলপানি পেয়ে বিলেত চলে গিয়েছিল। সেখানেও কি সব ভাল ভাল পাস-টাস করে একেবারে চাকরি পেয়ে এসেছে। আটশো টাকা মাইনে। পরে আরো অনেক হবে। চাকরির নামটা বলতে পারলাম না বাপু, খুব ভাল চাকরি।

হেমপ্রভা হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—আমার চাইতে তো ঢের ছোট তুমি, অমন সেকেলে বুড়ীর মত কথা কেন গা বাছা? তা যাক্, বিলেত ঘুরে এসে মেজাজটি আছে কেমন—মেম চায় না তো?

রাজলক্ষ্মী জিভ কাটেন।

—অমন কথা বলবেন না। বুলু কি সেই ছেলে? এখনো বাড়ী গেলেই আমার রান্নাঘরের দোরে খুরসি পিঁড়িতে বসে নারকোলনাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ চেয়ে খায়, রাইবল্লভের আরতির সময়ে গরদের ধুতি পরে চামর পাখা 'ঢোলায়'। বললে হয়তো ভাববেন বাড়িয়ে বলছি—তবু বলবো হাজারে একটা অমন ছেলে মেলে না। আপনার ছেলে ইচ্ছে করে অবহেলা করলেন, এখন দেখলে বলবেন—

হেমপ্রভা বাধা দিয়া উদাসস্বরে বললেন—আমার ছেলে! সে দেখছে বৈকি, সেখানে বসে সবই দেখতে পাচ্ছে। হয়তো এতদিনে তার অপরাধী মাকে ক্ষমাও করেছে।

রাজলক্ষ্মী থতমত খাইয়া বলেন—কেন? তিনি কি—

হেমপ্রভা মাথা নাড়েন—হ্যাঁ, এক যুগ হয়ে গেল। কেউ কারোর কোন খবরই তো রাখি না। আজ বিশ্বনাথ হঠাৎ তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন তাই। দেখি তাঁর কি ইচ্ছে!

মান খোয়াইয়া বলেন না—'এইবার তবে তোমাদের বৌ লইয়া যাও তোমরা'। শুধু কথা ফেলিয়া রাজলক্ষ্মীর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেন।

রাজলক্ষ্মী হাঁ হাঁ করিয়া ওঠেন—আর কি বিশ্বনাথের ইচ্ছে বুঝতে ভুল করি মা? এবার আর কোনো বাধা শুনবো না, আমার বুলুর হাতে পড়লে কোনো মেয়ে অসুখী হবে না এই ভরসাতেই জোর করে বলছি।

হেমপ্রভা মালাগাছটি কপালে ঠেকাইয়া মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন—আমার নাতনী তো তার যুগ্যি নাও হতে পারে বাছা। কিছুই তো জানো না তুমি।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ওঠেন, যেন ভারি একটা রহস্য করিয়াছেন হেমপ্রভা!

অতঃপর অনেক জ্ঞাতব্য এবং অজ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হয়, শুধু তাপসী যে কাশীতেই হেমপ্রভার নিকট রহিয়াছে, সেটুকু সুকৌশলে চাপিয়া যান হেমপ্রভা। কেবল বলেন—চলো না, আমার বাড়ী এই তো কাছে! এবেলা আমার কাছেই দুটো দানাপানির ব্যবস্থা হোক!

রাজলক্ষ্মী সামান্য অনুরোধেই রাজী হইয়া যান। হেমপ্রভার সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখার গরজ যেন তাঁহারই বেশী।

'দানাপানি' ব্যতীতও রাজলক্ষ্মীর জন্য যে 'তৃষ্ণার জল' তোলা রহিয়াছে হেমপ্রভার ঘরে, সেকথা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন রাজলক্ষ্মী?

নানির সঙ্গে একটি বিধবা ভদ্রমহিলাকে আসিতে দেখিয়া তাপসী নিজে হইতে তেমন গ্রাহ্য করে নাই। এমন তো মাঝে মাঝে আসে কেউ কেউ। ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইবার বা অপরের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া কথা কহিবার ইচ্ছাও করে না। অজানিত ব্যক্তির সেই চিঠিখানার অজ্ঞাত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আকাশপাতাল কল্পনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে বেচারা।

স্বাভাবিক দৃষ্টি লইয়া ঘরে ঢুকিলে ছেঁড়া চিঠির কুচিগুলা হেমপ্রভার দৃষ্টি এড়াইত না নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশেষ ব্যস্ততা লইয়া ঘরে ঢোকেন তিনি, তাই লক্ষ্য করেন না।

—তাপসী শোন্, একজন এখানে খাবে আজ। হ্যাঁ, এ বেলাই। একটু আয় দিকি আমার সঙ্গে, কুটনো-বাটনা করে দিবি!

তাপসী অবাক হইয়া বলে—আমি? আমার হাতে খাবে তোমরা?

—ওমা কথা শোনো মেয়ের! তোর হাতে খাবো না কিরে? সর্ব্বদা আ-কাচা কাপড়ে থাকিস—তাই ছুঁই ছুঁই করি, হাতে খাবো না কেন? হাঁড়দের বৌ নাকি তুই? নে চল্ দিকি, সেই সিল্কের কাপড়টা পরে—

উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভাবটা নাতনীর কাছে আর লুকাইতে পারেন না হেমপ্রভা।

তাপসী বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া দেখিয়া বলে—কে এসেছে নানি? খুব যে খুশী দেখছি! তোমার কোনো বন্ধু না আত্মীয় কেউ?

—আত্মীয় বন্ধু সবই। ভগবান বুঝি মুখ রাখলেন। যাক্, তুই আর দেরি করিসনে, আমি যাচ্ছি—ওমা, ঘরভর্ত্তি এত কাগজ ছড়ালে কে? কি এ?

—চিঠি।

—চিঠি! ও, সেই চিঠিখানা বুঝি? ছিঁড়েছিস কেন? কার চিঠি ছিল?

—জানি না।

—জানি না কি কথা! দেখিস নি?

—না।

হেমপ্রভা একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নাতনীর কাছে আগাইয়া আসেন। তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া আর্দ্রস্বরে বলেন—আমি জানতাম তাপস, ছোট হবার মত কাজ তুই করবি না। আশীর্ব্বাদ করছি তোর দুঃখের দিন এইবার শেষ হোক। আমার সঙ্গে যে এসেছে, বিশ্বনাথ তাকে আজ হাতে তুলে দিয়েছেন। বুলুর পিসি হয় ও। তোর পিসশাশুড়ী। চমকে উঠিস নি, কিচ্ছুটি বলতে হবে না তোকে, শুধু গিয়ে প্রণাম করবি। খাঁটি সোনা বুলু আমার, এখনও তোরই পথ চেয়ে বসে আছে, কোনো ভয় নেই!

তাপসী আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই একেবারের জন্য চমকাইয়া উঠিয়াই যেন স্তব্ধ হইয়া যান রাজলক্ষ্মী।

এই তাপসী?

বুলুর বৌ?

স্বপ্নের কল্পনাও হার মানে যে! এই বৌ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে বুলু? বুলুর মত স্বামীকে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পাইল না বলিয়া অপরিচিতা বধূর ভাগ্যেরই নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন এতদিন!

চিন্তার হাওয়াটা এবারে বিপরীতমুখী বহে।

উঃ, নির্দ্দয়তার মধ্যেও কী অনন্ত দয়া ভগবানের! বুলুর সম্প্রতিকার বিবাহটা ফস্কাইয়া না গিয়া যদি সত্যই ঘটিয়া যাইত।

কী সর্ব্বনাশই হইত!

এ বৌকে রাজলক্ষ্মী কোথায় রাখিবেন? বুকে না মাথায়? না, এবারে আর বোকামি করিবেন না বাবা, আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া তবে আর কাজ!

হেমপ্রভার হাতে-পায়ে ধরিতে হয় তাও রাজী। দোষ কি? সম্পর্কে গুরুজন তো। মানের জন্য প্রাণ যাক—অত কুসংস্কার নাই রাজলক্ষ্মীর!

হেমপ্রভাকে অবশ্য হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, নিজেই তো হাত বসিয়াছিলেন ভদ্রমহিলা। 'কাশীবাস' করিবার সাধুসঙ্কল্প অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিয়া রাজলক্ষ্মীও যেমন মহোৎসাহে দেশে ফেরার তোড়জোড় করেন, হেমপ্রভাও তেমনি আগ্রহেই দীর্ঘকালব্যাপী কাশীবাসে অভ্যস্ত জীবনকে আপাতত ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে থাকেন।

মন জিনিসটা এমন, একবার ছুটিলে আর ধরিয়া রাখা শক্ত। চিরদিনের প্রিয় আবাসস্থল স্বামীর ভিটার ছবিখানি মনে ফুটিয়া ওঠা পর্যন্ত হেমপ্রভার আর এক ঘণ্টাও দেরি সহে না।

কেবলমাত্র তাপসীর হিতার্থেই নয়, নিজের প্রীত্যর্থেও হাওয়ার ইচ্ছাটা এত প্রবল হয়।

হায়, কি মিথ্যা অভিমানেই তিনি সেই পুণ্যভূমিকে ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। এ অভিমানের মর্ম্ম বুঝিল কে?

না, শেষ জীবনে একবার গিয়া এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিবেন হেমপ্রভা।

অতএব 'দশচক্রে ভগবান ভূত'!

তাপসীর যাওয়া ছাড়া গতি কি?

মান খোয়াইয়া মায়ের কাছে তো সত্যি ফিরিয়া যাওয়া যায় না—বিনা সাধ্য-সাধনায়—এমন কি বিনা আহ্বানে!

অথচ চিত্রলেখার মনোভাব অনমনীয়।

তবে যাইবার গোছ করিতে করিতে এক সময় সে চুপি চুপি বলিয়া নেয়—দেখো নানি, দেশে গিয়ে আমি যে যার-তার বাড়ীতে থাকতে যাবো, তা মনেও কোরো না, বুঝলে? তোমার বরের সেই যে একটা সেকেলে পুরনো 'পেল্লায়' বাড়ী আছে, তারই এককোণে থাকতে দিও।

হেমপ্রভা হাসিয়া ফেলিয়া বলেন—ইস্ তাই বৈকি! কেন, আমার বরের বাড়ী তোকে থাকতে দেব কেন রে? নিজের বরের বাড়ী সামলাগে যা!

—দরকার নেই নানি, বাজে জিনিস সামলে। নিজেকে সামলাতে পারলেই বাঁচি এখন আমি।

পরিহাসচ্ছলে বলিলেও কথাটায় দুঃখময় সত্যের করুণ সুরটুকু ধরা পড়িয়া যায়।

সত্যই তো—নিজেকে সামলানোই কি সোজা?

এই দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেকে সামলাইয়া চলিতে চলিতে যে কাহিল হইয়া গেল বেচারা!

ট্রেনে 'ধক্‌ধক্' শব্দের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তাপসীর হৃৎপিণ্ডটাও যেন 'ধক্‌ধক্' করিতে থাকে। কি করিতে যাইতেছে সে? খেলাঘরের সেই বিবাহটাকে ঝালাইয়া লইয়া অপরিচিত বরের ঘর করিতে যাইতেছে—বিনা আমন্ত্রণে, বিনা আহ্বানে!

তাছাড়া কি? ভিতরে ভিতরে তেমনি একটা আকাঙ্ক্ষাই কি লুকাইয়া নাই?

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর আমন্ত্রণটাই কি চরম? লুব্ধ ভিক্ষুকের মত সেইটুকু সুযোগ লইয়া কৃতার্থমুখে দাঁড়াইতে হইবে সেই উদাসীন—হয়তো বা আত্মম্ভরী লোকটার কাছে? শেষ পর্য্যন্ত তাহার একটু করুণা লাভ করিয়াই ধন্য থাকিতে হইবে হয়তো! কে বলিতে পারে তার কি মতিগতি? রাজলক্ষ্মীর কথাবার্ত্তায় খুব বেশী আস্থা তাঁহার উপর রাখা চলে না। নেহাতই সাদামাটা বোকাসোকা মানুষ।

তবে?

তাপসী এখন করিবে কি?

সেই অজ্ঞাতস্বভাব লোকটার করুণার উপর জুলুম করিয়া, অথবা আইনের দাবী লইয়া নিজের ঠাঁই করিয়া লইতে হইবে তাহাকে? ফাঁকির সেই সিংহাসনে বসিয়া থাকিবে দশের একজন সাজিয়া? গহনা কাপড়ের ঝিলিক্ মারিয়া চরিয়া বেড়াইবে সমাজের মাঠে? অস্বীকৃত সম্বন্ধের জের টানিয়া নির্লজ্জের মত ভিক্ষাপাত্র হাতে ধরিয়া কোন্ মুখে গিয়া দাঁড়াইবে তাপসী? বলিবে কি সে?

কি বলিবেন চিত্রলেখা?

কি বলিবে ভাইয়েরা? আত্মসম্মান-জ্ঞানটা ভারি টনটনে ছিল না তাপসীর!

আর—

আর একখানি মুখ? সেই কি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে?

অজন্তার ছাঁদে গঠিত সেই ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বাঁকা রেখায় যে বাঁকা হাসির

ব্যঞ্জনা দেখা দিবে, তার তিক্ততা কল্পনাতেও সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে কি তাপসীর ?

ভাবিতে গেলেই বুকের ভেতরটা কেমন একটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়া ওঠে। কিরীটীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ঘুচাইয়া ফেলিতে হইবে—এই কথাটা যতবারই মনে মনে উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করে তাপসী, নিজেকে ভারি অসহায় লাগে।

বুলু কে ? বুলুর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি ? স্বামীত্বের দাবীতে বুলু আসিয়া অধিকার করিয়া লইবে তাহাকে ?

'স্বামী' শব্দটার মোহই কি তবে বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাপসীর ? এই শব্দের মোহ আজ যে শক্তি যোগাইতেছে, সে কি চিরদিন যোগাইতে পারিবে ? মোহ যখন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিবে ? মোহকে মনে মনে লালন করা এক, আর মূর্ত্তিকে সহ্য করা আর। প্রায় জীবনব্যাপী সংগ্রাম সত্ত্বেও যে তাপসী হৃদয়ধর্ম্মের কাছে পরাজিত হইয়াছে, একথা তো অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

কিরীটীই যে আজ তাহার একান্ত প্রিয়—প্রিয়তম, দূরে সরিয়া আসিয়া বড় স্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়িয়া গিয়াছে সেইটা।

দুইটা বুড়ীর প্রভাবে পড়িয়া এ কোন্ পথে পা বাড়াইতে বসিয়াছে সে ?

—ট্রেনের ধকলে বৌমার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে, একটু জল খাও না মা! রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে সংগৃহীত পেঁড়া ও চম্‌চম্ বাহির করিতে বসেন।

ট্রেনে তৃষ্ণা তাঁহারও পায়, কিন্তু বিধবার অত ক্ষুধা-তৃষ্ণার ধার ধারিলে চলে না।

তাপসী প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হেমপ্রভার দিকে তাকায়—ভাবটা যেন এত আত্মীয়তা বরদাস্ত হয় না বাপু!

হেমপ্রভা নাতনীকে চোখ টেপেন, অর্থাৎ করুক গে না বাপু, কি আর ফোস্কা পড়িবে তোমার গায়ে ?

রাজলক্ষ্মীর চোখে এ সব ভাববিনিময় ধরা পড়ে না। তিনি সহর্ষ চিত্তে খাবার গুছাইতে গুছাইতে বলেন—বুলু আমার পেঁড়ার ভারি ভক্ত, বলে—চারটি বালি-ধুলো মিশানো হলেও জিনিসটা কিন্তু বেশ পিসিমা। নইলে এই তো বর্দ্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা—ছোঁয়ও না।

বিরক্তি সত্ত্বেও হঠাৎ ভারি হাসি পায় তাপসীর।

কারণে অকারণে বুলুর প্রসঙ্গের অবতারণা না করিলে যেন চলে না বুড়ীর! ওঁর বুলুর পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অরুচির সমস্ত তালিকা মুখস্থ করাইয়া যেন তৈরি করিয়া ফেলিতে চান তাপসীকে!

বুড়ী, তোমার আশায় ছাই।

আসলে কাহারও ঘর করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই তাপসী। আপন হৃদয় লইয়া এক পাশে পড়িয়া থাকাই তাহার বিধিলিপি।

এতদিন 'স্বামী' নামক যে দুরতিক্রম্য বাধাটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া আপনাকে প্রিয়তমের কাছে নিঃশেষে সঁপিয়া দিবার উদগ্র কামনাকে ঠেকাইয়া আসিয়াছে, সেই স্বামীর যখন সন্ধান মিলিল, দেখা যাইতেছে তাহার হাতে সঁপিয়া দিবার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। হয়তো বা নিজেরই অজ্ঞাতসারে বেনামী ডাকে নিলাম হইয়া গিয়াছে তাপসী!

আগে খবর দেওয়া ছিল।

স্টেশনে গাড়ী আসিয়াছিল—দু'পক্ষেরই।

নিজ নিজ আস্তানায় যাইবার প্রাক্কালে আবার একপালা সম্ভাষণ-শেষে রাজলক্ষ্মী তাপসীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া যে কথাগুলি বলেন—তাহার সারার্থ এই, এই মুহূর্তেই তাপসীকে নিজের গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া পলাইবার দুর্দান্ত 'ইচ্ছাকে দমন করিয়া নিতান্তই শুকনো মুখে ফিরিতে হইতেছে তাঁহাকে, কারণ ঘরের লক্ষ্মীকে তো আর তেমন করিয়া লইয়া যাওয়া যায় না। শুভদিনে শুভলগ্নে বুলু নিজে যাইয়া মাথায় করিয়া বহিয়া আনিবে। বুলুকে দেশে আসিবার আদেশ করিয়া চিঠি তিনি কাশী হইতেই পোস্ট করিয়া আসিয়াছেন, রহস্য কিছুই প্রকাশ করেন নাই, শুধু জানাইয়াছেন, বিশেষ কারণে কাশীবাসের সংকল্প ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইতেছে রাজলক্ষ্মীকে, বুলু যেন অবিলম্বে একবার আসে।

এমন ছেলে, চিঠি পাওয়া মাত্র মোটর গাড়ীতেই ছুটিয়া আসিবে ঠিক, আজকালই আসিয়া পড়িবে। অতঃপর সামনেই যে শুভদিন পাওয়া যাইবে—

—আহা, 'ভদ্রমহিলা ভাবছেন, ওঁর সেই সোনার চাঁদ ভাইপোটির আশায় পথ চেয়ে আছি আমি!

গাড়ী ছাড়িবার পর মন্তব্যটি ব্যক্ত করে তাপসী।

যুগান্ত পরে দেশের মাটিতে পা দিয়া হেমপ্রভার উৎসুক দৃষ্টি যেন পথের

দু'পাশের মাঠঘাট গাছপালাগুলাকেও লেহন করিতেছিল তাপসীর কথায় অন্যমনস্ক ভাবে বলেন—তবে কার আশায় আছিস ?

—কারুর আশাতেই নয়। দেখো তোমার বরের সেই বিরাট অট্টালিকার গহ্বর থেকে কেউ টেনে বার করতে পারবে না আমাকে।

হেমপ্রভা সচকিত হইয়া বলেন—এখন থেকে মেজাজ বদলাসনে তাপস, ঠাট্টার কথাই বলতে বলতে সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। কথায় বলে—"হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা" !

—তবে কি তুমি বলতে চাও নানি, "সেধো ভাত খাবি" বললেই হ্যাংলার মত "আঁচাবো কোথায়" বলে ছুটে যাবো ?

—কথার দশা দেখো ! ছুটে তুই যাবি কেন—সেই-ই আসবে।

—সে-রকম আসার মূল্য কি নানি ? পিসির অঞ্চলনিধি সুবোধ বালক পিসির আদেশ পালন করতে আসবে--

—তা গুরুজনের আদেশ পালন করা বুঝি খারাপ ?

—খারাপ বলছি না নানি, তবু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কিছু বদল হওয়া উচিত। কই এতদিনের মধ্যে একবারও কি আমার জন্যে মাথাব্যথা হয়েছে ওর ? আমিই না হয় নিরুপায়, ও তো নয় নানি ! তবে আমি কেন—

হঠাৎ সমস্ত কৌতুকের ভাষা রুদ্ধ করিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে ডাগর কালো দুটি চোখের কোল বাহিয়া।

বাড়ী ঢুকিতেই নানা লোকের ভিড়ে, নানা কথায়, দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়ীখানার দুর্দ্দশার আলোচনায় হৃদয়-সমস্যা চাপা পড়িয়া যায়।

ঠাকুমা-নাতনী মহোৎসাহে গোছগাছে লাগিয়া যান।

সারাদিনের গোলমালে কিছুই মনে থাকে না, মনে পড়ে রাত্রে বিছানায় যাইবার আগে।

হেমপ্রভা তখনও নীচের তলায়, সরকার মশায়ের সঙ্গে অনেক কথা অনেক আলোচনায় বিভোর। যে সব বিষয়-সম্পত্তি তাপসীর নামে দানপত্র করিয়া গিয়াছিলেন, কি তাহার ব্যবস্থা হইতেছে, আদায়পত্রের হিসাব ঠিক রাখা হয় কিনা, নাতিরা কখনও আসে কিনা, ইত্যাদি কত সহস্র প্রশ্ন !

দূরে সরিয়া গেলে মনে হয় যেন খুব ত্যাগ করিলাম, কাছে আসিলেই ধরা

পড়ে—যথার্থ ত্যাগ করা কত কঠিন!

চিরবিশ্বস্ত সাধুপ্রকৃতি সরকার মহাশয়কেও মাঝে মাঝে জেরা করিয়া বসিতেছেন।

তাপসীকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য সাধ্যসাধনা করা সত্ত্বেও সে "দায় পড়েছে আমার, তোমার ওই সব কাগজপত্তর দেখলে গা জ্বলে যায় বাবা"—বলিয়া উপরে পলাইয়া আসিয়াছে।

পলাইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বাগানের দিকের এই ছোট ছাদটায়।

সেকেলে বাড়ী। মাপিয়া জুপিয়া অঙ্ক কষিয়া করা নয়, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে যেখানে সেখানে ছাদ, বারান্দা, চাতাল ইত্যাদি গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কর্ত্তারা।

বাগানের দিকের এই ছাদটি ভারি চমৎকার।

আসিয়া দাঁড়াইতেই এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে একটা দূরবিস্মৃত সুগন্ধভার যেন তাপসীর সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া আছাড় খায়।

কি এ—কোথায় ছিল এরা—এই চাঁপা মুচুকুন্দ মল্লিকার দল। যাহারা একদা তাপসীর ঘুমন্ত শিশুমনকে জাগাইয়া কৈশোরের সোনার দরজার চাবি দেখাইয়া দিয়াছিল!

সেই বৈশাখী রাত।

আশ্চর্য্য, তাপসীর বারো বছর বয়সের পর আর কি কোনোদিন বৈশাখ মাস আসে নাই! কত সময় তো কত জায়গায় ঘুরিয়াছে, কোথাও ফোটে নাই চাঁপা মুচুকুন্দ মল্লিকা!

মনে পড়িয়া গেল—ফুলের মালা পরার জন্য ছোট ভাইদের কাছে লাঞ্ছনা। আর—আর সেই দিনই না—সেইদিনই তো বল্লভজীর মন্দিরে গিয়াছিল তাহারা!

এই পরিবেশ আর এই গন্ধসমারোহের দৌত্যে বড় বেশী স্পষ্ট করিয়া সব মনে পড়িয়া যাইতেছে। কই এতদিন তো এমন করিয়া চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে নাই বল্লভজীর রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণের মাঝখানে সেই ফুটন্ত কমলের মত রক্তাভ দুইখানি পায়ের পাতা, বেনারসীর জোড়ের আলোয় ঝলসানো আঁচলটার

ঝক্‌ঝকানি, ঈষৎ কোঁকড়ানো রেশমী কালো চুলে ঘেরা উজ্জ্বল একখানি মুখ!

মুখ নয়—মুখের আভাস। মুখটা কিছুতেই মনে পড়ে না, স্মৃতির দরজায় মাথা কুটিয়া ফেলিলেও না।

সেই পায়ের নীচে নিজেকে বিকাইয়া দেওয়া, আজ কি এতই অসম্ভব! কে জানে হয়তো এই আবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে আটকাইয়া রাখিলে খুব অসম্ভব নয়!

কোন্‌টা ধর্ম্ম? কোন্‌টা ন্যায়?

মাথার উপর যে নক্ষত্রের দল নীচের মানুষের প্রতি অনুকম্পার দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছে, তাহারা কি বলিয়া দিবে তাপসীর কর্ত্তব্য কি?

অনেক রাত্রে হেমপ্রভা উপরে আসিয়া তাপসীকে ছাদে আবিষ্কার করিয়া অবাক হইয়া যান—এখনও ঘুমোসনি তুই? এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

—ঘুম আসছে না নানি।

—হেমপ্রভা মনে মনে হাসিয়া ওঠেন।

না আসাই তো উচিত! এই কি ঘুমের বয়স না ঘুমের রাত্রি! তবু তো মরুভূমির মত জীবন তাপসীর।

ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধশীতল জীবনেও কি বিরহের রাত্রে ঘুম আসে চোখে?

এই ছাদে এমনি শিথিল ভঙ্গীতে হেমপ্রভাও কি দাঁড়াইয়া থাকেন নাই কোনোদিন? পরনে নীলাম্বরী—খোঁপায় ফুলের মালা—চোখে প্রতীক্ষার ক্লান্তি আর মুখে অভিমানভার। উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—ঘোড়ার খুরের শব্দের আশায় কান পাতিয়া। ঘোড়ায় চড়া ছিল ব্রজেন্দ্রর একমাত্র শখ।

মাথার উপরকার ওই নক্ষত্রের দল আজকের হেমপ্রভাকে দেখিয়া বিশ্বাস করিবে এ কথা—না একযোগে হাসিয়া উঠিবে!

কিন্তু থাক্, আজকের সমস্যা হেমপ্রভার নয়—তাপসীর।

যার জীবনের কোন পরিচিত পদধ্বনি নাই।

—ঘুম সহজে আসবে না, নতুন জায়গা কিনা। চল্ শুয়ে শুয়ে গল্প করিগে। তোর মা'র আশা করি না, অভী সিধু যদি আসতো তো বেশ হতো। জীবনের পালা চোকাবার আগে একবার শেষ সাধ মিটিয়ে নিতাম।

হেমপ্রভার জীবনের পালা চুকিবার সময় হইয়াছে কিনা ভগবান জানেন,

কিন্তু সাধ মিটাইবার দায়টা পোহাইবার ভার ভদ্রলোক স্বয়ং লইয়াছেন দেখা গেল।

পরদিনই দরজার গোড়ায় ছোটখাটো ঝকঝকে একখানি মোটরগাড়ী আসিয়া হাজির।

সরকার মশাই যে লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিয়াছিলেন, সেকথা হেমপ্রভার জানা ছিল না। তিনি অবাক হইয়া যান।

অভী আসিয়াছে! সত্য না স্বপ্ন?

একা নয়—গাড়ীর মালিক এক বন্ধুকে লইয়া। ঠিক সমবয়সী বন্ধু নয়, তবে অসমবয়সী হইলেও মাঝে মাঝে বন্ধু হওয়া যায় বৈকি।

—নানি নানি, দেখছো তো তোমার টানে ছুটে এলাম!

—ওমা, আমার ভাগ্যি। গুরুদেব আমার মনের কথা কানে শুনেছেন। কে খবর দিলে? সরকার মশাই নিশ্চয়? একবার চাঁদমুখগুলি দেখবার জন্যে যে কি উতলা হচ্ছিলাম! সিধু আসে নি বুঝি?

—না, মা'র শরীর ভালো নয়, দুজনে এলাম না। অবশ্য এক হিসেবে দুজনেই এসেছি, সঙ্গে একটি বন্ধুলোক আছেন—বলতে পারি না তিনি আবার কার টানে এসেছেন! বলিয়া অমিতাভ দিদির দিকে একটা বাঁকা দৃষ্টি হানে—শ্লেষের নয়, কৌতুকের।

ধক্ করিয়া ওঠে তাপসীর বুকটা। কে আসিয়াছে সঙ্গে? তাই কি সম্ভব? না না, অমিতাভ যে দু'চক্ষের বিষ দেখে তাহাকে! নিজে সঙ্গে করিয়া আনিবে? পাগল নাকি তাপসী? কিন্তু কে?

একেই তো বাড়ী ছাড়িয়া কাশী পালানোর লজ্জায় তাপসী ছোট ভাইটিকে দেখিয়া তেমন উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনায় ছুটিয়া আসিতে পারে নাই, প্রসন্নমুখে শুধু নানির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এখন অভীর কথায় একেবারেই মূক হইয়া যায় বেচারা।

বেশীক্ষণ চিন্তা করিতে হয় না, অভী দু'এক কথার পরই ব্যস্তভাবে বলে—আরে, ভদ্রলোককে কি গাড়ীতেই বসিয়ে রাখা হবে! যাই ডেকে আনি। দিদি, মিস্টার মুখার্জ্জি এসেছেন—বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

দিদি তো সেইখানেই জমিয়া হিম।

যা আশঙ্কা তাই সত্য! কি সর্ব্বনাশ! অভীটাই বা হঠাৎ এত বদলাইল কেমন করিয়া! কোন্ ধরণের ঘুষের দ্বারা অভীকে হাত করা যায়!

হেমপ্রভা সচকিত হইয়া বলেন—কি বলে গেল অভী? কে এসেছে? সেই হতভাগাটা? আবার এখানেও ধাওয়া করেছে এসে? এ কি বেহায়া লোক গো! খবরদার, তুই সামনে বেরোবি না, বুঝলি?

তাপসীর কি বোধশক্তি আছে এখনও যে বুঝিবে!

তাহার সমস্ত স্নায়ুশিরায় অণুপরমাণুতে যে ধ্বনিত হইতেছে শুধু একটা অবোধ্য হাহাকার।

চিঠিটা না পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলার চাইতেই যে দেখা না করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া আরো কত কঠিন, সে বোধও আর নাই তাপসীর।

'বেহায়া হতভাগা'টাকে সঙ্গে বহিয়া আনার জন্য মনে মনে অমিতাভর বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে হেমপ্রভা উঁকি মারিয়া দেখিবার জন্য সিঁড়ির কাছ বরাবর যাইতে না যাইতেই অপরাধীযুগল উঠিয়া আসে উপরতলায়।

পর পর দুইটি পদধ্বনি।

প্রথম পদধ্বনি তারুণ্যে উচ্ছল অকুণ্ঠ দাবীর, দ্বিতীয়টি যৌবন-সংযত কুণ্ঠিত সংশয়ের।

—এই যে নানি আমার বন্ধু—এঁর গাড়ীতেই এলাম আমরা।

অমিতাভর কথার উত্তরে হেমপ্রভা বিরক্তি-তিক্ত স্বর কোনো প্রকারে সহজ করিয়া বলেন—বেশ বেশ, নিয়ে গিয়ে বসাওগে ঘরে।

—বা রে! ঘরে বসাবো মানে? তোমার সঙ্গে ভাব করবার ইচ্ছেতেই তো এখানে আসা এঁর। তাই না মিস্টার মুখার্জ্জি?

অজন্তার ছাঁদে গঠিত ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বাঁকা রেখায় একটি কৌতুকহাস্যের রেখা ফুটিয়া ওঠে।

হেমপ্রভা অবাক হইয়া ভাবেন, কোথায় যেন দেখিয়াছেন ছেলেটিকে। ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু ভারি সুকুমার মুখখানি। বিদ্বেষ রাখা কঠিন, তবু তাপসীর সঙ্গে যোগসূত্রের কল্পনায় জোর করিয়া স্নেহকে আসিতে দেন না। নীরসকণ্ঠে বলেন—আমার সঙ্গে আবার ভাব-আলাপ! সেকেলে বুড়ী আমরা, ভদ্দর সমাজের অযোগ্য।

হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে অমিতাভ।

এদিকে তাপসীর অবস্থা শোচনীয়। দাঁড়াইয়া থাকাও যত অস্বস্তিকর, হঠাৎ চলিয়া যাওয়াও তার চাইতে কম অস্বস্তির নয়।

হেমপ্রভা নিতান্তই অমিতাভর মান বা মন রাখিতে কথা বলিবার জন্যই বলেন—কি নাম ছেলেটির?

—কিরীটীকুমার মুখার্জ্জি।

উত্তর দেয় অমিতাভ।

—বাপ-মা আছেন তো? কটি ভাই-বোন তোমরা?

পুনরায় এই একটি মামুলী প্রশ্ন করেন হেমপ্রভা এবারে সরাসরি কিরীটীকেই করেন।

—না নানি, বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই আমার।

নানি!

হঠাৎ যেন কোথা হইতে এক ঝলক মমতা আসিয়া হেমপ্রভার হৃদয়ে আছড়াইয়া পড়ে।...কেউ কোথাও নাই! আহা! তাই অমন স্নেহ-কাঙাল মুখ। জোর করিয়াও বিদ্বেষ আনা যায় না। মুখেও সেই 'আহা' শব্দ উচ্চারিত হয়—কেউ নেই! আহা! বাড়ী কোথায় ভাই তোমার?

—এই পাশের গ্রামে।

তাপসী ততক্ষণে সরিতে সরিতে দালানের ওদিকে গিয়া প্রায় দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তবু কথাটা শুনিয়া চমকিয়া যায়।...পাশের গ্রামে! কই একথা তো কোনোদিন জানা ছিল না। কিন্তু থাকিবেই বা কেন? তাপসী কি কোনোদিন জানিতে চাহিয়াছে, কিরীটীর ঘর-বাড়ী কোথায়? অনাগ্রহ দেখাইতে গিয়া ভদ্রতাবোধও থাকে নাই সব সময়। মা-বাপ যে নাই, সেটুকুই শুধু আলাপ-আলোচনার ফাঁকে জানা হইয়া গিয়াছে মাত্র।

হেমপ্রভা চমকান না, বরং প্রসন্নমুখে বলেন—তাই বুঝি? তাই ভাবছি কোথায় যেন দেখেছি। পাশের গ্রামের তো—ছেলেবেলায় কোনো সূত্রে দেখে থাকবো।

—দেখেছেন অবশ্যই। নেহাত ক্ষীণ হইলেও যোগসূত্র একটা রয়েছে যখন! বঙ্কিম ওষ্ঠাধরের ভঙ্গিমায় তেমনি বাঁকা হাসি। বিদ্রূপের নয়, কৌতুকের। হাসিতেছে অমিতাভও। তাহার চাপাহাসির আভায় উজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া কেমন যেন বোকা বনিয়া যায় তাপসী।

কি ব্যাপার! যোগসূত্র যাহা আছে তাহাতে নানির সঙ্গে সম্বন্ধ কি— আর ঘটা করিয়া বলিয়া বেড়াইবার মতই কথা কি সেটা? তবে? অমিতাভর মুখে যেন কি একটা ষড়যন্ত্রের রহস্য আঁকা। এরা এখানে আসিয়াছে কিসের ফন্দি আঁটিয়া—সেই বিবাহ ব্যাপারটাই আবার কোনোপ্রকারে বাধাইতে চায় নাকি? কিন্তু অভী—

হেমপ্রভা আপন মনেই উত্তর দেন—যোগসূত্র! সে কি? বুঝতে পারছি না তো! কে ভাই তুমি? বাবার নাম কি তোমার?

—বাবার নাম ছিল কনক মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সে বললে কি চিনতে পারবেন আপনি? দাদুর নামটাই বরং জানতে পারেন!

—দাদু! কে তোমার দাদু বলো তো? এ অঞ্চলের পুরনো কালের সকলের নামই তো চিনতাম—তবে অনেকদিন দেশছাড়া। ভুলেও যাচ্ছি—

তাপসী অমন করিয়া তাকাইয়া আছে কেন? সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়াই উত্তরটা শুনিতে চায় নাকি—কি বলিবে কিরীটী? কি বলিতেছে?

—ভুলে যাবেন না দোহাই আপনার। আপনি সুদ্ধ ভুলে গেলেই সর্ব্বনাশ! দাদুর নাম ছিল স্বর্গত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ..আমি বুলু।

কি চমৎকার হাসিমাখা মুখে কথাটা উচ্চারণ করিল!

জিভে বাধিল না। গলায় আটকাইয়া গেল না। অনায়াস-লীলায় কিরীটী উচ্চারণ করিল—আমি বুলু।...এটা কি একটা বিশ্বাস করিবার মত কথা? পরিহাস করিবার আর ভাষা পাইল না?...নাকি অমিতাভর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নানিকে ঠকাইতে আসিয়াছে? অমিতাভ আবার কবে ওর বন্ধু হইল? তাপসী চলিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা উল্টাইয়া গিয়াছিল নাকি? নানিকে ঠকাইয়া ও কি তাপসীকে গ্রাস করিতে চায়? তাপসীকে ও ভাবিয়াছে কি?

কি বলাবলি করিতেছে ওরা?

এ সব কথার কোনো অর্থ আছে নাকি? কি বলিতেছে?

—আমার পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর চিঠি পেয়েই অবশ্য এসেছি আমি। তবে এখানে অমিতাভই জোর করে আগে এনে হাজির করেছে। 'চিনি না' বলে তাড়িয়ে-টাড়িয়ে দেবেন না তো!

ও কি মানুষ? ও কি পাষাণ? তাপসী কি এখনও সজ্ঞানে আছে? কিরীটী নামটা তবে ছদ্মনাম—না কি সত্য? এই দীর্ঘকালের মধ্যে কই

স্বামীর নামটা তো জানিয়া রাখে নাই তাপসী! আশ্চর্য! আশ্চর্য! বুলু যে একটা সত্যকার নাম হইতে পারে না, নিতান্তই আদরের ডাক, তাও খেয়াল হয় নাই কোনোদিন।

তাপসী মূর্খ, তাপসী অবোধ—তাপসী বাস্তববুদ্ধিহীন স্বপ্নজগতের জীব।

কিন্তু কিরীটী?

সেও কি তাপসীর মত অবোধ? নাকি জানিয়া শুনিয়া বসিয়া বসিয়া মজা দেখিয়াছে। নির্দ্দয় আমোদে এই নিদারুণ যন্ত্রণা দিব্য উপভোগ করিয়াছে! আর তাপসী ওর এই নিষ্ঠুর আনন্দের খোরাক যোগাইয়া আসিতেছে!

কিরীটীর সমস্ত ব্যবহারটাই পূর্ব্ব-পরিকল্পিত, এইটুকু মাথায় খেলিয়া যাইতেই মাথার সমস্ত রক্ত যেন আগুন হইয়া উঠে। তাপসীকে লইয়া অবিরত কেবল খেলাই চলিবে? আচ্ছা, ওর মতলবটা তবে কি ছিল—ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেকে ঢাকিয়া তাপসীকে পরীক্ষা করা নয় তো? তরলচিত্ত তাপসী পুরুষকণ্ঠের আহ্বান মাত্রেই সাড়া দিয়া বসে কিনা তারই পরীক্ষা? হয়তো—হয়তো সে সময় এমনও ভাবিয়াছে—এই-ই স্বভাব তাপসীর, যার-তার ডাকে আপনাকে বিকাইয়া দেওয়া!

ভাবিয়াছে আর মনে মনে কতই না জানি হাসিয়াছে! হয়তো আজও ধিক্কার দিতেই আসিয়াছে!

দুরন্ত অভিমানে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠে। বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

এই ব্যক্তির সঙ্গে নূতন করিয়া গাঁটছড়া বাঁধিতে হইবে? কৃতার্থচিত্তে ওর চরণচিহ্নের অনুসরণ করিয়া যাইতে হইবে ওর ঘর করিতে?

অসম্ভব!

তাপসীর ধ্যানের দেবতাকে ভাঙিয়া চুরি করিল কিরীটী—'বুলু' বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু তাপসীকে ইচ্ছা করিলেই অধিকার করা যাইবে, একথা মনে করিবার মত ধৃষ্টতা যেন কিছুতেই না হয় ওর। আত্মপরিচয় গোপনকারী কাপুরুষের সঙ্গে তাপসীর কোনো সম্বন্ধ নাই!

হেমপ্রভার বহু সাধ্যসাধনা, অমিতাভর কাটাছাঁটা তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্য, কিছুই যখন টলাইতে পারিল না তাপসীকে, "শুধু একবার দেখা করার" প্রস্তাবটা পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য হইয়া গেল, অগত্যাই তখন ম্লান হাসি হাসিয়া বিদায় লইতে

হইল বুলুকে।

বাগ দেখাইয়া অভুক্ত অমিতাভও ফিরতি ট্রেনে ফিরিয়া গেল।

দিদির ব্যবহার চিরদিনই তাহার কাছে বিরক্তিকর প্রহেলিকা।

আগে অবশ্য নিজেই সে কিরীটীকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিত না, কিন্তু সে তো পরিচয় জানা ছিল না বলিয়াই। এখন সব দিকেই যখন এত সুব্যবস্থা দেখা গেল, তখনই কিনা বাঁকিয়া বসিল দিদি। খামখেয়ালের কি একটা সীমা থাকা উচিত নয়?

দিব্য তো প্রেমে পড়িয়াছিলে বাবা, এখন সত্যকার স্বামী জানিয়াই সে সব উবিয়া গেল? ঈশ্বর জানেন—সেই বিবাহ-প্রস্তাবের দিন তলে তলে কি মারাত্মক ঝগড়াঝাঁটি হইয়াছিল, তা নয় তো কখনো সেই আসর হইতে নিরুদ্দেশ হয় মানুষ?

তাপসীর নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, পাটনা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কিরীটী যেদিন কেবলমাত্র অমিতাভর কাছেই আপন পরিচয় ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা চাহিল, সেইদিন হইতে তাহাকে এত বেশী ভালবাসিতে শুরু করিয়াছে অমিতাভ যে ভালবাসাটা প্রায় পূজার পর্য্যায়ে উঠিয়াছে।

এ হেন ব্যক্তি, অমিতাভ যাহাকে দেবতার কাছাকাছি তুলিয়াছে, তাহাকে কিনা স্রেফ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল দিদি। 'পাকা দেখা'র দিন বাড়ী ছাড়িয়া পালানোর স্বপক্ষে তবু একটা যুক্তি আছে, কিন্তু এ যে নাহোক অপমান।

অপমান ছাড়া আর কি?

কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে আপত্তি জানানোই তো অপমান করা।

প্রকাণ্ড বাড়ীর নিতান্ত নির্জ্জন একটি কোণ বাছিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল তাপসী।

স্তম্ভিত বৈকি।

নিজের ব্যবহারে, কিরীটীর ব্যবহারে—বোধ করি স্বয়ং বিধাতাপুরুষের ব্যবহারেও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে সে। তাপসীকে গড়িয়া জগতে পাঠানোর পর তাপসী সম্বন্ধে এত সচেতন কেন তিনি? ভুলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না—অবিরত তাহাকে পিটিয়া পিটিয়া আর কোন্ ভাবে গড়িতে চান? আচ্ছা—

সাবিত্রীর দেশের মেয়েদের গঠনকার্য্যটা কি তিনি ইট-কাঠ দিয়া করেন? রক্ত-মাংস থাকে না? 'হৃদয়' বলিয়া কোনো বস্তু থাকিবার আইন তাহাদের নাই?

সেই অন্যায় আইন অমান্য করে নাই কেন তাপসী? কেন হৃদয়ের অনুশাসন মানিয়া যা খুশী করে নাই এতদিন?

মন ভাসিয়া যায় অন্য স্রোতে।

চিরদিনের স্বপ্নময় 'বুলু'ই কিনা মিস্টার মুখার্জ্জি!— এত কাণ্ডের পরও ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না।

আচ্ছা, কোন্ নামটা মানায় তাহাকে? 'কিরীটী' না 'বুলু'? বুলু বুলু বুলু! তাপসীর আবাল্যের ধ্যানের মন্ত্র। কিরীটীর মূর্ত্তিটা কিছুদিনের জন্য তাহার বুদ্ধিটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু নাম?

নাঃ, নামটাকে কোনোদিন প্রাধান্য দেয় নাই তাপসী।

"মিস্টার মুখার্জ্জি" ছাড়া আর যে কোন সংজ্ঞা আছে তাহার, সে কথা মনেই পড়ে নাই কোনোদিন। কিরীটী নামটা কবে কখন প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে!

সে নামটা ছিল কেবল পরিচয় মাত্র।

সত্য ছিল মানুষটা।

কিন্তু 'বুলু' শব্দটা তো কেবলমাত্র একটা নাম নয়, ওটা যেন একটা ধ্বনিময় অনুভূতি—যে অনুভূতি মিশাইয়া আছে তাপসীর সমস্ত সত্তায় সমগ্র চৈতন্যে।

সেই বুলু নাকি হেমপ্রভার কাছে অকপটে স্বীকার করিয়া গিয়াছে, সেও তাপসীকে সেই বিবাহের রাত্রি হইতেই রীতিমত ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তাপসীকে পাইবার স্বপ্নই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান ধারণা।

তবু যে ক্লতি হইয়া আসিয়া এক কথায় প্রার্থনা করিয়া বসে নাই, সেটা যদিও অনেকটাই চক্ষুলজ্জা, অথবা সাহসের অভাব, তবু গ্রহণ করিবার আগে একবার পরীক্ষা করিবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারে নাই সে।

সেই লোভেই আপন পরিচয় গোপন করিয়া এ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে।

অর্থাৎ তাপসীর ধারণা ভুল নয়। যাচাই।

হেমপ্রভা বলিতেছেন, অন্যায় কিছুই করে নাই বুলু। সত্যই তে অতকাল আগের সেই কচি কিশলয়টি এতগুলো বৎসরের রৌদ্রে তাপে হিমে

ঝড়ে বিবর্ণ হইয়া যায় নাই, ম্লান হইয়া যায় নাই, ঠিক তেমনই আছে, এ প্রমাণ সে পাইবে কোথায়! পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছাটা স্বাভাবিক বৈকি। সেই ইচ্ছার বশেই চিত্রলেখার পরিবারের কাছাকাছি আসিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে তাহাকে—অনেক চেষ্টায়, অনেক কৌশলে।

অবশ্য চিত্রলেখার চোখে পড়িবার পর আর বেশী পরিশ্রম করিতে হয় নাই তাহাকে। অজস্র সুযোগ তিনিই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

হয়তো হেমপ্রভার কথাই ঠিক।

কিন্তু সেই নিদারুণ পরীক্ষা দিতে বুক যার ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে—তিল তিল করিয়া পিষিয়া মরিতে হইয়াছে—সে কি বলিবে?

বলিবে কাজটা খুব ন্যায্য—খুব ভাল হইয়াছে বুলুর?

অহরহ যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাপসী, সে যন্ত্রণা কি চোখে পড়ে নাই তাহার? দিনের পর দিন সেই যন্ত্রণা চোখে দেখিয়াও পরীক্ষা করিবার সাধ মেটে নাই? অবশেষে যখন সেই শ্রান্ত অবসন্ন মানুষটা হাল ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তখন আসিলেন হাসিমুখে অভয়বাণী শোনাইতে! বিজয়ীর মহিমায় স্বচ্ছন্দ অবহেলায় বলিতে বাধিল না—মিথ্যা এতদিন যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছ, প্রয়োজন ছিল না! প্রয়োজন ছিল না এত কষ্টের! আমিই তোমার ইষ্টদেবতা, প্রলোভনের ছদ্মবেশে পরীক্ষা করিয়াছিলাম মাত্র!

দীর্ঘ পত্রের মারফৎ সেই কথাই নাকি জানাইয়া দিয়াছিল সে—যে চিঠি কাশীর বাড়ীতে তাপসী অপঠিত অবস্থায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। কে জানে খুলিয়া পড়িলে আজকের ইতিহাস অন্যরূপ হইত কিনা।

কিন্তু এখন আর বদলানো যায় না।

কোনো কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই তাপসীর—না যুদ্ধে, না রাজত্বে। তাই বুক ছিঁড়িয়া পড়িলেও মুখের হাসি বজায় রাখিয়া সে হেমপ্রভার কাছে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—কেউ যে আমাকে যাচিয়ে বাজিয়ে অবশেষে গ্রহণ করে কৃতার্থ করবে, ওসব বরদাস্ত করতে পারবো না বাপু। তোমার আদরের কুটুম্ব এসেছে, সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়ে আপ্যায়িত করোগে, আমার আশা ছাড়ো।

হেমপ্রভা আর্তপ্রশ্ন করিয়াছিলেন—আর এই যে তুই ঘর ছেড়ে পালিয়ে

এসেছিলি বর খুঁজতে, সেই বরকে পেয়ে ছাড়বি? এমন করে ফিরিয়ে দিলে ওকি আর কখনো সাধতে আসবে?

হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া মুখের হাসি বজায় রাখিয়াছিল তাপসী —তা কি করবো বলো নানি? সকলের কি বর জোটে? আমার অদৃষ্টে বরের বদলে শাপ!

হেমপ্রভা কপালে ঘা মারিয়া বলিয়াছিলেন—এ কি সর্ব্বনাশা বুদ্ধি তোর মাথায় খেলছে তাপস? ভগবান নিজে হাতে ক'রে এত বড় সৌভাগ্য বয়ে এনে দিচ্ছেন, তুই এতটুকু ছুতোয় অবহেলা করে ফেলে দিবি সে সৌভাগ্য! অভিমানটাই এত বড় হলো!

—অভিমান কিসের? শুধুই মান, নানি। মা বসুমতী যে আজকাল বুড়ো হয়ে কালা হয়ে গেছেন, ডেকে মরে গেলেও তো বেচারা মেয়েদের মান-সম্ভ্রম বাঁচাতে দ্বিধা হয়ে কোল দেবেন না। তা নইলে তো পরীক্ষার জ্বালায় পাতালে প্রবেশ করেই বাঁচতাম!

অগত্যাই রাগ করিয়া উঠিয়া গিয়াছেন হেমপ্রভা। ওদিকে রাগ জানাইতে জলস্পর্শ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে অমিতাভ। আর —আর নাকি ম্লান হাসি হাসিয়া বিদায় লইয়াছে বুলু!

তাপসী রহিয়া গিয়াছে একা।

তাপসীকে যেন একযোগে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে সকলে।

তবে কি তাপসীর ভুল? প্রচণ্ড যে দুইটো সমস্যার জট তাপসীর জীবনকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল, এত সহজে সে জট খুলিয়া যাওয়ায় ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ছিল তার? সকল দ্বন্দ্বের অবসানে কাম্য প্রিয়তমকে লাভ করিয়া কৃতার্থচিত্তে দশের একজন হইয়া বেড়াইতে পারিলেই স্বাভাবিক হইত?

না, তা হয় না।

সুখের বদলে সম্মান বিকাইয়া দেওয়া যায় না। সুখ বিদায় হোক—সম্মান থাক জীবনে।

হেমপ্রভা আবার কাশী ফিরিয়া যাইবার গোছগাছ করিতেছেন।

মিথ্যা আর এখানে বসিয়া থাকিয়া লাভ কি! উঁচু মাথাটা তো হেঁট হইয়াই

ছিল, তবু কি বিধাতার আশা মেটে নাই ? মাটির সঙ্গে মিশাইয়া ছাড়িলেন ? যাক, আর কেন ? রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিয়া অনেক আশা লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন, সব আশায় ছাই দিয়াছে তাপসী নিজে।

এতদিনে হুঁশ হইতেছে হেমপ্রভার, তাপসী চিত্রলেখারই মেয়ে। দেখিতে যতই নিরীহ হোক, জিদে মার চাইতে একবিন্দুও খাটো নয়। যাক, হেমপ্রভার বিধিলিপি এই। তাপসীর 'ভাল' করিবার ভাগ্য তাঁহার নয়।

রাজলক্ষ্মীকে মুখ দেখাইবার মুখ আব নাই। দুই-দুইবার শুভদিন দেখিয়া গাড়ী পাঠাইয়াছিল রাজলক্ষ্মী বৌ লইয়া যাইতে, শূন্য ফিরিয়া গিয়াছে সে গাড়ী।

তাপসীর নাকি স্বামীর ঘরে 'বৌ' হইয়া ঘর করিবার স্পৃহা আর নাই। কলিকাতায়-ফিবিয়া গিয়া চাকরি করিবে সে।

আরও থাকিবেন হেমপ্রভা ?

গলায় দড়ি দিবার বয়স নাই, তাই বাঁচিয়া থাকা।

যাত্রার আগের দিন একবার···হয়তো শেষবারের মতই বল্লভজীর মন্দিরে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন হেমপ্রভা। গাড়ীর কথা বলা আছে, মালী ফুল ও মালা লইয়া আসিলেই হয়।

বেলা হইয়া যাইতেছে বলিয়া ঘরবার করিতেছেন, হঠাৎ চাহিয়া দেখেন তাপসী আসতেছে ছোট একটা ডালায় ফুল লইয়া, অর্থাৎ ভোর হইতে বাগানেই ছিল সে।

এ কয়দিন আর ঠাকুমা-নাতনীতে খুব বেশী কাথাবার্ত্তা ছিল না, দুইজনেই চুপচাপ গম্ভীর। আগে হইলে হয়তো তাপসী কলহাস্যে ছুটিয়া আসিয়া বাগানের ফুলসম্ভারের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিত, নয়তো হেমপ্রভাই 'ফুলরাণী'র সঙ্গে তুলনা করিয়া মুখর হইয়া উঠিতেন নাতনীর রূপের প্রশংসায়।

আজকের মনের অবস্থা অন্য।

তাই হেমপ্রভা শুধু চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, আর তাপসী ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া ম্লানহাস্যে বলে—চলো নানি, তোমার সঙ্গে গিয়ে একটু পুণ্য অর্জ্জন করে আসি।

—তুমি কোথায় যাবে ?

তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন হেমপ্রভা ?

—সেই যে কোথায় তোমার সেই 'রাইবল্লভ' না 'রাধাবল্লভ' আছেন,

দেখেই আসি একবার জন্মের শোধ !

—বালাই ষাঠ্ ।

নিজের অজ্ঞাতসারেই অতি ব্যবহৃত এই কল্যাণ-মন্ত্রটুকু উচ্চারণ করিয়া হেমপ্রভা বলেন—আর তাঁর ওপর দয়া কেন ? তাঁর তল্লাট থেকে চলেই তো যাচ্ছো মুখ ফিরিয়ে !

—কে যে কার দিক থেকে মুখ ফেরায়, কে যে কখন বিমুখ হয় সব কি আমরা বুঝতে পারি নানি ? চলো না দেখেই আসি তোমাদের দয়াল প্রভুকে।

হেমপ্রভা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলেন—ব্যঙ্গ করে দেবদর্শনে যেতে নেই বাছা, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই।

—না নানি, ঘুরেই আসি। ব্যঙ্গ তোমার প্রভুকে করছি না, করছি তাঁর নামটাকে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কাকে বলে !

—নিজের চোখ কানা হলেই তাঁকে কানা দেখে মানুষ। হেমপ্রভা রাগিয়া ওঠেন—দয়ার সাগর তিনি, যা দয়া করেছিলেন তোমায়, হিতাহিত জ্ঞানের লেশমাত্র থাকলেও এমন করে সে দয়া অবহেলা করতে না। তাই বলছি—ভক্তি-বিশ্বাস যখন নেই তখন আর কেন যাওয়া ?

—তা লোকে তো সং-এর পুতুল দেখতেও যায় বাপু, তাই না হয়—, খুব চটছো বুঝি ?

—হুঁঃ, আমার আবার চটাচটি ! তাও তোমাদের কথায় ! যাক্‌গে যাবে বলছো চলো। তা এই মুহূর্ত্তেই যাবে, না একখানা পরিষ্কার কাপড়জামা পরবে ছেদ্দা করে ?

—পরিষ্কার কাপড় ! খোলো দেখি, স্টক তো তেমন ভারী নয় !

বস্তুতঃ ঝোঁকের মাথায় একবস্ত্রে কলিকাতা ছাড়ার পর, কাশীর বাজারে কেনা খানকতক সাধারণ শাড়ীই আপাততঃ ভরসা তাপসীর।

হেমপ্রভার প্রাণটা 'হায় হায়' করিয়া ওঠে—এ যেন "লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা !" রাজার ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া এখন কিনা—উঃ, আধুনিক মেয়েদের চরণে শতকোটি প্রণাম ! সর্ব্বস্ব হারাইয়া স্বচ্ছন্দে হাসিয়া বেড়ানো কেবল আজকালকার এই সব বুনো ঘোড়ার মত মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

বুলুর মায়ের দরুন এক বাক্স গহনা আর সোনা-ঝলসানো জমকালো একখানা বেনারসী শাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বৌ লইতে পাঠাইয়াছিলেন রাজলক্ষ্মী, গাড়ীর সঙ্গে সেগুলাও ফেরত দিতে হইয়াছে। নূতন করিয়া সেই শোক উথলাইয়া

ওঠে হেমপ্রভার।

কিন্তু এ কি!

সব শোক উড়াইয়া চোখ জুড়াইয়া দিলে যে তাপসী। এতকাল আগের শাড়ীখানা কোথায় পাইল সে! টুকটুকে লাল জর্জেটের উপর রূপালি জরির চওড়া ভারী পাড় বসানো সেই শাড়ী। যে শাড়ী পরা লক্ষ্মীরূপ দেখিয়া বুড়ো কান্তি মুখুজ্জের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। কে জানে কোথায় কোন্ দেরাজের কোণে পড়িয়া ছিল! মূল্যবান জিনিস, এই দীর্ঘ দিনের অব্যবহারেও ম্লান হয় নাই। প্রায় তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি কোমল আছে।

হেমপ্রভার অনেক ভাবে-ভরা দৃষ্টির সামনে একটু কুণ্ঠিত না হইয়া পারে না তাপসী। ঝোঁকের মাথায় পরিয়া ফেলিয়া বেজায় লজ্জা করিতেছে যে!

—এ কাপড় কোথায় পেলি রে?

কথা কহার উপলক্ষ পাইয়া বাঁচে তাপসী। তাড়াতাড়ি বলে—এখানেই ছিল গো নানি, তোমার সেই প্রকাণ্ড সিন্দুকটার মধ্যে। কত সব শাল র‍্যাপার পুরনো পুরনো—দেখছিলাম সেদিন। এ শাড়ীখানা কি করে ঢুকে গেছে তার সঙ্গে কে জানে! তবে দুঃখের বিষয়, পোকায় কেটে দিয়েছে অনেক জায়গায়।

—আহা রে! তাও বলি—কাটবে না তো কি করবে? এতদিন যে রেখেছে এই ঢের। কিন্তু এ শাড়ী তোমরা পরলে তো মানায় না বাছা! তোমরা আপিসে যাবে, সাইকেল চড়বে, ট্রামগাড়ীর জন্যে ছুটোছুটি করবে, তোমাদের ওই সব খাকির কোট-পাজামা পরাই উচিত। এ তো বিয়ের কনের শাড়ী।

—ধ্যেৎ! শাড়ীতে যেন লেখা থাকে!···চলো বাপু, ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে।

—ফুল তো সবই শুকোলো তোমার, দেবতার চরণে আর দিলে কই? নারায়ণ! নারায়ণ!

গাড়ী আসিয়া ডাকাডাকি করিতেছে।

আগামী কাল ফুলদোল।

মন্দিরের সাজসজ্জায়, বিগ্রহের কেশবাসে আসন্ন উৎসবের সমারোহ। ধূপধুনা ও অজস্র সুগন্ধিপুষ্পের সম্মিলিত সুরভিতে বৈশাখী প্রভাতের চঞ্চল

হাওয়া যেন কম্পিত মন্থর।

নিজেদের হাতের ফুলের ডালা বিগ্রহের সামনে নামাইয়া দিয়া ঠাকুমা-নাতনী সামনের চাতালের একধারে বসিয়া পড়েন। বৈশাখের শুচিস্নিগ্ধ নির্মল সকালের মতই শুভ্র নির্মল মার্বেল পাথরের মেঝে—বসিতে লোভ হয়।

উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখে তাপসী—বহুদিন আগে আর একবার যে আসিযাছিল, সেও এমনি বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ছিল না? কি অদ্ভুত যোগাযোগ! সেদিনের সেই সুরভিবাহিত এলোমেলো বাতাস কি এতদিন লুকাইয়া ছিল মন্দিরের খিলানে খিলানে, কার্নিশের খাঁজে খাঁজে? তাপসীর সাড়া পাইয়া আজ আবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে?

সুগন্ধের মত বিস্মৃত স্মৃতির বাহক এমন আর কে আছে? কালের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া মুহূর্তের মধ্যে অতীতকে ফিরাইয়া আনিবার এমন ক্ষমতা আর কার কাছে?

তাই বিস্মৃত দিনের সেই সোনালী সকালটি যেন সহসা এই ফুলচন্দন ধূপধুনার সৌরভজড়িত উত্তরীয় গায়ে দিয়া একমুখ হাসি লইয়া তাপসীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

—আচ্ছা নানি, সেই ঘোড়াটা আছে এখনো? রথের কাঠের ঘোড়াটা?

অকস্মাৎ এ-হেন অভিনব প্রশ্নে চমকিত হেমপ্রভা হাতের জপের মালাটা স্থগিত রাখিয়া বলেন—কি আছে? রথের ঘোড়া!

—হ্যাঁ গো, সেই যে বাবলুবাবুর যা দেখে বেজায় স্ফূর্তি লেগেছিল।

—আ কপাল! এত বেশ থাকতে সেই কাঠের ঘোড়াটার চিন্তা? আছে অবিশ্যিই, যাবে আর কোথায়?

—তা চল না, ঘুরে ঘুরে সব দেখি।

হেমপ্রভা অসমাপ্ত মালাগাছটি আবার কপালে ঠেকাইয়া বলেন—দেখবার আর কি আছে? এই যা দেখছি জগতের সারবস্তু। তোর ইচ্ছে হয়, একটু ঘুরেফিরে দেখে আয়। এখুনি হয়তো জয়কেষ্ট গাড়ী এনে ডাকাডাকি করবে।

তাপসী ইতস্তত করিয়া বলে—কেউ কিছু বলবে না তো?

—ওমা বলবে আবার কি! এই তো এত লোক আসছে, যাচ্ছে, বসছে, পূজো দিচ্ছে, মালা দিচ্ছে—কে কাকে কি বলছে!

—আমি একলা যাবো? তুমি যাবে না নানি?

—না ভাই, আর ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছেও নেই, সামর্থ্যও নেই। তুই একপাক

দেখে আয় না। পিছন দিকে মস্ত নাকি বাগান করেছে!

তাপসী কুণ্ঠিতভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া প্রাঙ্গণে নামে।

কেন কে জানে—রংচটা রথ, কাঠের ঘোড়া ও মাটির সখী-পুতুল জড়ো করিয়া রাখা মন্দিরের সেই অবহেলিত দিকটা দেখিবার জন্য কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

মন্দিরের পিছনে এদিকটা একেবারে নির্জ্জন।

মন্দিরে আসিয়া ভাঙা পুতুল দেখিবার শখ আবার কার হয় তাপসীর মত! টানা লম্বা একটা দালানের ভিতর গাদাগাদি করিয়া নূতন পুরনো ভাঙা আস্ত অনেক পুতুল। প্রমাণ মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট এই পুতুলগুলি দেখিতে মজা লাগে বেশ। ছেলেমানুষের মত কৌতূহলী দৃষ্টি লইয়া দেখিতে থাকে তাপসী।

এত পুতুল সেবারে ছিল না তো কই! বৎসরে বৎসরে নূতন করিয়া যোগ হইয়াছে বোধ হয়!

দালানের বাহিরে খোলা মাঠে কাত হইয়া পড়িয়া আছে ঘোড়াটা।

কি আশ্চর্য্য!

এদের কি মায়া-মমতা বলিয়া কিছুই নাই?

'এদের' ভাবিতে অকস্মাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া মুহূর্ত্তে লজ্জায় লাল হইয়া ওঠে তাপসী।...মন্দিরটা কান্তি মুখুজ্জের না? বুলুর দাদুর?...আসিবার আগে অত খেয়াল হয় নাই তো!

হেমপ্রভা আসিতেছেন শুনিয়া মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ওদের কেউ যদি এখানে উপস্থিত থাকে?

কেউ আর কে—রাজলক্ষ্মী!

দেখা হইয়া গেলে লজ্জায় মারা যাইবে কিন্তু তাপসী।

চোখের আড়ালে গাড়ী ফেরত দেওয়া যত সহজ, চোখোচোখি হইয়া প্রত্যাখ্যান তত সহজ কি? থাক্ বাবা, আর ভাঙা পুতুল দেখিয়া কাজ নাই। নিজের ভাঙা ভাগ্য লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়াই ভাল।

কিন্তু এ কী!

ফিরিবার পথ কোথায়? পথ আগলাইয়া যে দাঁড়াইয়া আছে, মুখ ফিরাতেই

চোখোচোখি হইয়া গেল তাহার সঙ্গে।

মিস্টার মুখার্জ্জি বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। নিতান্তই বুলু।

চওড়া জরির আঁচলাদার সাদা বেনারসীর জোড় পরা সুগঠিত সুঠাম দেহ—রক্ত কমলের মত নগ্ন দুখানি পা—অবিন্যস্ত চুলের নীচে মসৃণ ললাটে সাদা চন্দনের একটি টিপ।

যুগান্তর পূর্ব্বের সেই কিশোর দেবতার মূর্ত্তি ধরিয়া তাপসীকে কেউ ছলনা করিতে আসিল নাকি!

কি এক অজানা আশঙ্কায় বুক থরথর করিতেছে যে।

হায়! হায়! তাপসী কেন আসিয়াছিল এখানে? এখন কেমন করিয়া পালাইবে সে? ওর কাছ ঘেঁষিয়া যাওয়া ছাড়া তো আর উপায় নাই। তবে?

মাটির ওই পুতুলগুলোর মত শুধু নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে নিষ্পলক দৃষ্টিতে?

কিন্তু তাপসী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই কি সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে?

তাপসীর সম্মুখবর্ত্তী এই ছদ্মবেশী দেবমূর্ত্তি তো মন্দিরে অবস্থিত চিরকিশোর মূর্ত্তির মত স্থাণু নয়। সে যে চঞ্চল ব্যাকুল, নিতান্তই অস্থির।

তবে?

তবে কেমন করিয়া নিজেকে সামলাইবে সে? কেমন করিয়া কঠিন হইয়া থাকিবে মানসম্ভ্রমের দুর্ব্বহ ভার বহিয়া?

হায় ভগবান! সমস্ত মানসম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়া এ কি করিয়া বসিল তাপসী? নিতান্ত অসহায়ের মত নিজেকে কোথায় সঁপিয়া দিল বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে?

কোথায় লুকানো ছিল তাপসীর পরাজয়ের শৃঙ্খল!

খসিয়া পড়া খস্‌খসে বেনারসী চাদরের আবরণমুক্ত স্পন্দিত বক্ষের স্পর্শের ভিতর? আবেগতপ্ত বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনের মধ্যে?

পরাজয়!

পরাজয়ে এত সুখ? এমন নিশ্চিন্ত শান্তি? বিজয়ীর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দেওয়ায় এত তৃপ্তি?

একথা তো আগে কেউ বলিয়া দেয় নাই তাপসীকে!

আবাল্যসঞ্চিত ব্যর্থ বেদনার জ্বালা, সন্ত-প্রজ্বলিত অগ্নিপরীক্ষার জ্বালা, নিজেকে বশে রাখিবার অক্ষমতায় জ্বালা—সব কিছুই যে জুড়াইয়া গেল।

এই অনাস্বাদিত শান্তি কি অবাস্তব? এই অজানিত অনুভূতি কি স্বপ্ন? এই নির্জ্জন পরিবেশ, এই পুষ্পগন্ধবাহী চঞ্চল বাতাস, এই চির-আকাঙ্ক্ষিত উষ্ণ স্পর্শ—সমস্তই কি কল্পনা?

সত্য হইলে কি এত অনায়াসে হার মানিতে পারিত তাপসী?

না-না, মুহূর্ত্তের বিহ্বলতাকে প্রশ্রয় দিবে না সে।

পরীক্ষকের কাছে হার মানা যায় না।

—ছেড়ে দিন আমায়!

—ছেড়ে? না, না, আর ছেড়ে দেবো না তোমায়। কোনোদিন না, কখনো না।

তবু ছাড়াইয়া লয় তাপসী। মুক্ত করিয়া লয় নিজেকে পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই বাহুবন্ধন হইতে। প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলে—কেন আপনি অপমান করবেন আমায়?

—ছি তাপসী! ও কথা বলতে নেই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিরদিন আপনি অপমান করেছেন আমায়। এততেও আশ মেটে নি? আবার চান আমি আপনার কাছেই—

আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে তাপসীর।

কিরীটীর কণ্ঠস্বরও গভীর আবেগপূর্ণ—হ্যাঁ তাপসী, 'আবার' নয়—বরাবর চাই, চিরদিনই চাই। দিনেরাত্রে অহরহ চেয়েছি তুমি আমার কাছে এসে ধন্য করবে আমায়। সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষার বশে—ছেলেবেলায় কলেজ কামাই করে ঘুরে বেড়িয়েছি তোমার স্কুলের কাছে, কলেজের রাস্তায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তোমাদের বাড়ীর কাছের পার্কের বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোকার মত বসে থেকেছি দোতলার ঘরে জানালার আলোর দিকে তাকিয়ে। কোন্ ঘরে তুমি থাকো, কোন্খানে তুমি বসো কিছুই জানতাম না—তবু বসে থাকা চাই। সাত বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি কত দেশ-বিদেশে, তবু সর্ব্বদা মনে পড়েছে—কি এক অদৃশ্যসূত্রে বাঁধা আছি তোমার সঙ্গে। ফিরে এসে তাই লোভ সামলাতে পারলাম না, অথচ পারলাম না নিজের পরিচয় দিয়ে সোজাসুজি তোমাকে

প্রার্থনা করতে। সাহস হলো না। যে বন্ধন আমার কাছে সত্য, তা তোমার কাছে হয়তো নিতান্তই মিথ্যে, এই ছিল আশঙ্কা।

—আর, আর কি যন্ত্রণা আমি পেয়েছি, অহরহ কি যুদ্ধ করতে হয়েছে—তা কি বুঝতে পারেন নি?

—হয়তো পেরেছি, হয়তো পারি নি, বুদ্ধির বড়াই করতে চাই না তাপসী! তবু প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করেছি ছদ্মবেশ মোচন করতে, সহজ হয়ে নিজেকে ধরা দিতে, কিন্তু পারি নি। আমার এই অক্ষমতাই তোমার এই যন্ত্রণার মূল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, যেদিন সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেলাম, ঠিক সেদিনই তুমি অভিমানে ঘর ছাড়লে। চিঠির ভেতর দিয়ে অপরাধ স্বীকার করে চাইলাম তোমার ক্ষমা, নানির কাছে শুনলাম তুমি সে চিঠি পড়লেই না, ছিঁড়ে ফেললে।

—কি লিখেছিলেন তাতে? হাল্‌কা ভাবে প্রশ্ন করে তাপসী। কি লিখিয়াছিল সে সংবাদ তো নানির কাছে পাইয়াছে!

—কি আর, আমার দুষ্কৃতির কাহিনী। অবশেষে পরিচয় দিলাম অভীর কাছে। সে বেচারা অনুতাপানলে দগ্ধ হতে লাগলো।

—আর মা?

—মা? মৃদু হাসে কিরীটী—মা এত বেশী গুম্ হয়ে গেলেন শুনে, যে সেই অবধি আর কথাই কইলেন না আমার সঙ্গে। বোধ হয় ভাবলেন আমি তাঁকে ঠকিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য্য, চিনতে যদিও না পেরেছিলে, আমার নামটাও কি সত্যি জানতে না তুমি? সেই অদ্ভুত রাত্রে মন্ত্র-উচ্চারণের সঙ্গেও কি কানে যায় নি একবার?

তাপসী মাথা নাড়ে। মুহূর্তে ছবির মত ভাসিয়া ওঠে সেই অদ্ভুত রাত্রের দৃশ্য তাপসীর দৃষ্টির সামনে।

হায়, তাপসীর কি জ্ঞান চৈতন্য অনুভূতি কিছুই ছিল সেদিন!

—তাপসী, আজকের এই ঘটনাকে কি দেবতার দান বলে মনে হয় না তোমার? আমার তো আজ এদিকে আসবার কোনো ঠিকই ছিল না, সামান্ত আগেও না। নিতান্তই পিসিমার উপরোধে পড়ে দেখতে এলাম পুতুলগুলোর অবস্থা—'পোটো' লাগিয়ে সংস্কার করতে হবে নাকি ওগুলো!···কিন্তু আমি কি ভেবেছিলাম—স্বপ্নেও ভেবেছিলাম—মাটির পুতুলের ঘরে দেখা মিলবে সোনার পুতুলের! এই বল্লভজীর মন্দিরেই প্রথম দেখেছিলাম তোমায়, তাই

হয়তো বল্লভজীই ষড়যন্ত্র করে দুইজনকেই টেনে আনলেন তাঁর এলাকায়। এ সৌভাগ্যকে অবহেলা কোরো না তাপসী।

কিন্তু তাপসী কেমন করিয়া বলিবে—'না, অবহেলা করিব না!'

মানসম্ভ্রম চুলায় যাক, কিন্তু লজ্জা? দুর্নিবার লজ্জায় যে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে তাহার। বলিতে পারিলে তো অনেক কথাই বলার ছিল। তাপসীর জীবনেই কি নাই ব্যর্থ সন্ধানের হাস্যকর ইতিহাস? পথে পথে, কলেজে, হোস্টেলে, আরো কত সম্ভব-অসম্ভব স্থানে? হায়! তেমন করিয়া গুছাইয়া বলিবার শক্তি তাহার কোথায়?

—উত্তর দেবে না? চুপ করেই থাকবে? বলো কি করবে তুমি?

দ্বিধা কাটাইয়া সহসা মুখ তুলিয়া যে উত্তর দেয় তাপসী, সেটা কেবলমাত্র কিরীটীকেই আহত করে না, যেন তাপসীর কানকেও আঘাত করে। এমন করিয়া তো বলিতে চাহে নাই সে! কিন্তু বলিয়াছে—

—আমাকে আপনারা সকলেই ছেড়ে দিন দয়া করে, যেমন করে হোক একটা কাজ খুঁজে নেবো আমি।

—কাজ! কাজ করবে তুমি? কি কাজ? চাকরি?

—ক্ষতি কি?

—লাভ-ক্ষতির হিসেব সকলের সমান নয় তাপসী, কিন্তু থাক্, অনুরোধ-উপরোধের চাপে আর বিব্রত করবো না তোমাকে। আমার জন্যে তোমার মন প্রস্তুত হয়ে নেই, এই কথাটাই বুঝতে একটু দেরি হয়ে গেলো বলে অনেক জ্বালাতন সইতে হলো তোমায়। যাক ক্ষমা চাইছি। জানোই তো পৃথিবীতে নির্বোধ লোকের সংখ্যাই বেশী।

অজন্তার ছাঁদে গড়া রেখাম্বিত অধরে ম্লান একটু হাসি ফুটিয়া ওঠে।

—আচ্ছা চলি। আজকের এই অপ্রত্যাশিত দেখাটা মনে থাকিবে, কি বলো? আমি অবশ্য আমার কথাই বলছি।...নানির সঙ্গে এসেছো বোধ হয়? অনেকক্ষণ আছো, খুঁজছেন হয়তো।...কবে ফিরবে কলকাতায়?

—কাল।

অস্ফুট একটা শব্দ হইতে আন্দাজে ধরিয়া লইতে হয় উত্তরটা।

—বেশী লাভ করতে গিয়ে সবই হারাতে হলো, তাই না তাপসী? এর পর দৈবাৎ কোনোদিন দেখা করতে গেলেও হয়তো ধৃষ্টতা হবে, কি বলো?

মাটিতে লুটাইয়া পড়া উত্তরীয়ের আঁচলটা কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে

ফিরিয়া যায় কিরীটী।

অবাক নেত্রে চাহিয়া থাকে তাপসী। চলিয়া গেল? তাপসীর জীবনে আর কোনোদিন দেখা মিলিবে না ওর? ধূ ধূ মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন জীবন লইয়া করিবে কি তাপসী? না না, ছুটিয়া গিয়া ফিরাইয়া আনিবে সে, কিন্তু কেমন করিয়া ফিরাইবে? ছুটিয়া গিয়ে পায়ে পড়িবে? নিতান্ত নির্লজ্জের মত দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আশ্রয় লইবে স্বর্গের দুয়ারে? সকল জ্বালা জুড়াইয়া দেওয়া সেই শান্তির স্বর্গে? ক্ষণপূর্ব্বে মুহূর্ত্তের জন্য যে স্বর্গের আস্বাদ পাইয়া আপনাকে হারাইতে বসিয়াছিল তাপসী!

না—কিছুই পারে না তাপসী, শুধু দাঁড়াইয়া থাকিবার মত ক্ষমতার অভাবেই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে ধূলার উপর।

কতক্ষণ বসিয়াছিল তাপসী?

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল নাকি? চৈতন্য ছিল তো? সময়ের জ্ঞান হারাইয়া গিয়াছে কেন?…পিঠের উপর আলগোছ একটু স্পর্শ কার হাতের!

—তাপসী, চলো, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

কি মমতা-স্নিগ্ধকণ্ঠস্বর!

—তোমাকে এখানে একা ফেলে চলে যেতে পারলাম না তাপসী, আবার এলাম নির্লজ্জের মত। চলো, শুধু তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার অনুমতিটুকু চাইছি।

কিন্তু অনুমতি দেবে কে? ভিতরে যাহার ভূমিকম্পের আলোড়ন চলিতেছে? শুধু কণ্ঠের স্বরে এত মমতা ভরা থাকিতে পারে? যে মেয়ে আবাল্য হাসির আড়ালে সব কিছু গোপন করিয়া আসিয়াছে, সে-ই কিনা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল কণ্ঠস্বরের সামান্য একটু স্নেহস্পর্শে?

হায় হায়! লজ্জা রাখিবার স্থান রহিল কই!

লজ্জা-সম্ভ্রম সবই যে গেল।

অশ্রুকণিকাকে গোপন করা চলে, কিন্তু অশ্রুসাগরকে?

—তাপসী ওঠো। তাপসী চলো লক্ষ্মীটি। কত লোক ঘোরাঘুরি করছে, হঠাৎ কেউ এদিকে এসে পড়লে, হয়তো কি না কি ভাববে!

—কেন ভাববে? কিছু ভাববে না কেউ। যাবো না আমি।

এতক্ষণে কথা বাহির হয় তাপসীর মুখে।

—যাবে না? কিরীটী মৃদু হাসে—আমার পক্ষে তো শাপে বর! তাহলে এইভাবে বসে থাকা যাক, কি বলো? বলিয়া নিজেও বেনারসীর জোড়সমেত ধূলার উপর বসিয়া পড়ে, কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখিয়া।

—তাপসী, সত্যই যদি এমনি বসে থাকা যেতো চিরদিন, চিরকাল!

ভাঙা মাটির পুতুলগুলার পানে নির্নিমেষে দৃষ্টি মেলিয়া কি দেখিতেছিল তাপসী কে জানে, বুলুর কথায় মুখ ফিরাইয়া এক নিমেষ চোখ তুলিয়া চায়।

আবার কিছুক্ষণ কাটে।

এক সময় সামান্য একটু হাসিয়া বুলু বলে—সত্যিই আমি বড় নির্লজ্জ তাপসী, তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছো না, তবু জবরদস্তি করে বসে আছি কাছে। কিছুতেই যেন উঠে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আচ্ছা মাঝখানের এই বছরগুলো কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না? সেই যেদিন—নতুন দৃষ্টি নিয়ে প্রথম তাকিয়েছিলাম পৃথিবীর দিকে—যেদিন জীবনের কোনো জটিলতা ছিল না, কোনো সমস্যা ছিল না—যখন মান-অপমানের প্রশ্ন নিয়ে সব কিছুকে বিচার করতে বসতে হতো না!

হায়, তাপসী কেন কিছুই বলিতে পারে না?

সমস্ত ভাল ভাল কথাগুলো বুলুই বলিয়া লইবে? সে কথা কি তাপসীও ভাবিতেছে না?

তবু নিজেকে ধরা দিবার একান্ত বাসনাকে গলা টিপিয়া মারিয়া, নিজের মনকে যাচাই করিতে হইতেছে তাহাকে—এ ব্যক্তি যদি কিরীটী না হইয়া কেবলমাত্র 'বুলু' হইত, কি করিত সে? 'স্বামী' বলিয়া বিনা দ্বিধায় সমর্পণের মন্ত্র পড়িতে পারিত?

কিন্তু এ কথাও কি বলা যায় না—কিরীটীকে দেখিবা মাত্র সমস্ত প্রাণ যে তাহার কাছে আছড়াইয়া পড়িতে চাহিত, সে 'বুলু' বলিয়াই। কই, আর কবে কাহার উপর এ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে তাপসী?

অথচ এ-হেন অলৌকিক কথা কে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করিবার মত কথা কি?

বুলু বোধ করি কোনো একটু উত্তরের আশায় মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলে—আমি তোমাকে বুঝতে পারছি তাপসী, মনকে প্রস্তুত করে

নেবার অবসর পাও নি তুমি। অপেক্ষা করে থাকবো সেই আশায়। কিন্তু চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। নানি হয়তো খুঁজবেন, নাটমন্দিরে বসে রয়েছেন।

নানি!

ও তাই তো! তাপসী তো এখানে হঠাৎ আকাশ হইতে আসিয়া পড়ে নাই! আশ্চর্য্য, কিছুই মনে ছিল না। বুলু উঠিতে বলিলে কি হইবে, তাপসীর কি উঠিবার ক্ষমতা আছে?

উঠিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে এই স্বর্গসুখ চিরদিনের মত ফুরাইয়া যাইবে।

সত্যই যদি এমনই বসিয়া থাকা যাইত! অনন্ত দিন—অনন্ত রাত্রি!

বুলু আবার হঠাৎ একটু হাসিয়া উঠিয়া বলে—হঠাৎ যদি কেউ দেখে ফেলে কি ভাববে বলো দেখি? পারলে না বলতে? ভাববে সদ্য বিয়ের বর-কনে! তোমার শাড়ীটা ঠিক নূতন কনের মত—আর আমি—আমি তো বল্লভজীর বেগার খাটতে বরসজ্জা করেই বসে আছি। লোকে হয়তো ভাববে দুজনে বাসর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে একটু নির্জ্জন অবসরের আশায়, তাই না? মনে হচ্ছে যেন ঠিক অবিকল এই রকম শাড়ীতেই প্রথম দেখেছিলাম তোমায়। ওই কলকাতার বাড়ীতে তো কোনোদিন এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দাও নি তাপসী। এ যেন এখানকার তুমি!

এত কথার উত্তরে তাপসী শুধু বলে—সেই শাড়ীটাই।

—সত্যি? আশ্চর্য্য তো! এখনও রয়েছে? এতদিন পরে আবার হঠাৎ এইখানেই আজ তোমার পরতে ইচ্ছা হলো! সবটাই আশ্চর্য্য!

এবারে তাপসী মুখ তুলিয়া বড় স্পষ্ট করিয়া তাকায়। ম্লান হাসির সঙ্গে বলে—আমার জীবনের তো সবটাই আশ্চর্য্য! চলুন। কবে ফিরবেন কলকাতায়?

—ফেরবার দিনের প্রোগ্রাম যা কিছু ছিল, সবই তো বাতিল হয়ে গেলো। পরে ভেবেছিলাম আজই চলে যাবো, তাও ইচ্ছে হচ্ছে না। এই দেশটায় তুমি আছো ভাবতেও ভালো লাগে। একটু থামিয়া সামান্য হাসিয়া বলে—ফেরার সময়কার ছবিটা সম্বন্ধে কত কল্পনাই করেছিলাম বোকার মত!

সহসা আবার একটা আকস্মিক ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নে যত্নে-গঠিত অভিমানের প্রাসাদ বিদীর্ণ হইয়া গেলো নাকি? নাকি স্বর্গচ্যুত হইবার

আশঙ্কায় এতক্ষণে হুঁশ হইল তাপসীর? তাই পাতাল-প্রবেশের পরিবর্ত্তে স্বর্গকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া আগলাইতে চায়?

—কেন তবে সে ছবি ছিঁড়ে ফেললে? কেড়ে নিয়ে যেতে পারো না? পারো না জোর করতে? সব দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে ফিরে যাবে?

—তাপসী! তাপসী!

অজন্তার শিল্পছাঁদে গঠিত ওষ্ঠাধরযুগল নামিয়া আসিয়াছে, অর্দ্ধচন্দ্রের ছাঁদে গড়া শুভ্র একখানি ললাটের উপর।

—তাপসী, এ সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারবো তো? এ আমার কল্পনার ছলনা নয় তো?

আকাঙ্ক্ষিত নিতান্ত পীড়নে নিপীড়িত হইয়া অশ্রু-ছলছল চোখে হাসিয়া ফেলে তাপসী। হাসিয়া বলে—উঃ, অত বেশী জোর করতে বলি নি তা বলে!

—ইস্! খুব লেগেছে? আমি একটা বুনো। হঠাৎ সৌভাগ্যের আশায় দিশেহারা হয়ে ওজন রাখিতে পারি নি। আচ্ছা ছেড়ে দিলাম—দেখি তো—তাকাও না একটু, শুভদৃষ্টির সময় তাকিয়ে দেখো নি বলেই না এত বিপত্তি! কি হলো আবার? মুখে মেঘ নামছে কেন?

—না, ভাবছি—ভাবছি তুমি যদি 'তুমি' না হয়ে কেবলমাত্র 'বুলু' হতে, কি হতো।

কিরীটী গভীর স্বরে বলে—প্রায় এই রকমই হতো তাপসী। হয়তো 'কেবলমাত্র বুলু' আমার চাইতে একটু কম বেহায়া হতো। কিন্তু আমার ক্যাপাসিটি তো বারেবারেই প্রমাণ হয়ে গেছে, গৌরব যা কিছু বুলুরই। আমার ভাগ্যে বিয়ের ভয়ে বৌ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়! সত্যি তাপসী, যেদিন সেই উৎসব-বাড়ী থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তুমি, সেদিন যে কি অদ্ভুত অবস্থা আমার! তবু ভেবে ভেবে মনকে ঠিক দিলাম—আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ রীতিমত প্রবল। তোমার মানসিক দ্বন্দ্বের ছবি চোখ এড়ায় নি। সে সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম যে তবু ভাল, ছদ্মবেশের আড়ালেই আছি। শুধু প্রার্থীর পক্ষে প্রত্যাখ্যান বরং সহনীয়, দাবীদারের পক্ষে বেজায় অপমান নয় কি? হায় হায়, তখন কি জানি আমার সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নয়—দুগ্ধপোষ্য বুলু! জানলে এইরকম জোর করে ধরে শুনিয়ে ছাড়তাম 'হত-ভাগ্য কিরীটীই সেই ভাগ্যবান বুলু'! আবার যেদিন হঠাৎ কলকাতার

বাড়ীতে পিসিমার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ গিয়ে জানালে—দেশের বাড়ীতে নানি এসেছে তোমাকে নিয়ে, কি জানি কেন আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। মনে হলো তোমাকে পেয়েই গেলাম বুঝিবা। শেষে আবার কি যে হলো—

তাপসী মৃদু হাসির মাধ্যমে বলে—দুর্লভ বস্তু অত সহজে পাওয়া যায় না।

—ঠিক বলেছো তাপসী, খুব সত্যি। তাই এত কষ্ট, এত আয়োজনের দরকার ছিল। চলো দুজনে গিয়ে প্রণাম করিগে তাঁকে, যিনি অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে এমন নিখুঁত আয়োজনটি সম্ভব করেছেন।

সদ্যোলব্ধ সৌভাগ্যে বিভোর তাপসী সচকিত প্রশ্ন করে—কাকে? কে?

—কেন আমাদের বঙ্কভজী! পাকা খেলোয়াড় হয়েও হঠাৎ বেজায় একটা ভুল 'চাল' দিয়ে ফেলে ভারী বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। শোধ-রাতে এক যুগ লেগে গেলো বেচারার। মাত হতেই বসেছিলেন প্রায়।

কথার মাঝখানে হঠাৎ সচকিত বুলু কাহাকে যেন দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হাস্যে খানিকটা দাঁড়ায়।

দালানের সারি সারি খিলানের একটা থামের পাশে হেমপ্রভা দাঁড়াইয়া। কখন যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এটা টেরও পায় নাই।

পাইবার কথাও অবশ্য নয়।

বুলু তো সরিয়া দাঁড়াইয়া আর লাজুক মুখে অপ্রতিভ হাসি মাখাইয়া মুখরক্ষা করিল—কিন্তু তাপসী?

নানির সামনে ধরা পড়িয়া যাওয়ায়, লজ্জায় আরক্তিম মুখখানা লুকাইবার মত জায়গার অভাবেই বোধ করি সরিয়া আসিয়া নানির কাঁধেই মুখটা চাপিয়া ধরে। তেমনি মুখ চাপিয়া বলিয়া ফেলে—আবেগবিহ্বল অর্থহীন অস্ফুট একটা কথা—নানি, নানি, কেন তুমি—

হেমপ্রভারও কি কথা বলিবার অবস্থা আছে?

কিংবা হেমপ্রভা বলিয়াই আছে, তাই কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া প্রায় হাসির সঙ্গে বলেন—'কি আমি' কেন? কেন আড়ি পাতছি?

—ধ্যেৎ, যাও!

—হ্যাঁ, যাবো। এইবার যাবো। এতদিনে ছুটি দিলেন বিশ্বনাথ, এইবার

বড় শান্তি নিয়ে তাঁর রাজ্যে ফিরে যাবো। মুখ তোল্ দিদি,—বুলু এসো ভাই, কাছে এসো। চোখ ভরে একবার একসঙ্গে দেখি দুজনকে। বৃথা অভিমানে এতদিনে তাঁর নামে কত কলঙ্ক দিয়ে এসেছি, আজ বুঝলাম এতটাই দরকার ছিল। যে বস্তু সহজে মেলে তার মূল্য বোঝা যায় না। ধরা যায় না খাঁটি ও অ-খাঁটি! কি জ্বালা, এ মেয়েটা মুখ তোলে না কেন গো? ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল যে আমার। ঠাকুর-মন্দিরে বসে থেকে থেকে ভেবে বাঁচি না নাতনী আমার গেলো কোথায়? কাঠের ঘোড়া পক্ষীরাজ হয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো নাকি! অধৈর্য্য হয়ে উঠে এলাম। নাও, এখন দুজনে মনে মনে যত খুশি গাল দাও বুড়ীকে!

—শেষ—